নববর্ষের উপহার !

গ্রন্থকারের

আর একখানি চিত্তবিনোদন অপূর্ব্ব পৌরাণিক কাহিনী !

(শীঘ্রই বাহির হইবে)

পতির জন্য পত্নী যে কতখানি আত্মত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার এবং নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারেন, তাহা এই শৈব্যা-চরিত্রে ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত আছে। পড়িতে পড়িতে অতি নিষ্ঠুরও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

ছাপা, কাগজ ও সাজসজ্জা

তেমনই মনোরম, তেমনই অদৃষ্ট পূর্ব্ব !

বহু কষ্টে, বহু অর্থব্যয় করিয়া—

অতি সুন্দর সুন্দর চিত্রদ্বারা ইহার অঙ্গ

মণ্ডিত করা হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

চিত্র-সূচী।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখনকার তরুণ লেখকগণ যে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে। ভিন্ন দেশের প্রেমকাহিনী বাঙ্গালী নায়ক-নায়িকার নামে চালাইয়া লেখকগণ আমাদের সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনীতে বিবাহ-পূর্ব্ব প্রেম বা পূর্ব্বরাগ বর্ণিত আছে, সাবিত্রী স্বয়ং নিজের স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ইহা আদৌ য়ুরোপীয় আদর্শে নহে। সাবিত্রীর পূর্ব্বরাগ পিতৃ-আদেশ-নিয়ন্ত্রিত, সংযম-কঠিন, ধর্ম্মমূলক; উহা ভারতকল্পিত দাম্পত্য-স্বর্গের অম্লান পারিজাত পুষ্প—বিদেশীয় আইভি লতার ফুল নহে। এই পূর্ব্বরাগ বর্ণনার সুযোগে লেখক যে প্রণয়িযুগ্মের দীর্ঘশ্বাস, তপ্ত অশ্রু ও বিবিধ প্রতিশ্রুতিপূরিত বাক্যের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া ফেলেন নাই, ইহাতেই আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি; আমাদের মানস-সরোবরের ফুল্লারবিন্দ যে বসোরার গোলাপে পরিণত হয় নাই—ইহাতেই আমরা সুখী। লেখক এই পবিত্র প্রেম সংযম ও ধর্ম্মের উপাদানে গড়িয়াছেন; আমরা নিশ্চিন্ত মনে এই পুস্তকখানি বালক-বালিকাগণের হস্তে অর্পণ করিতে

পারি। যে প্রেম আসন্ন মৃত্যুর দ্বারেও একনিষ্ঠ ও নির্ভীক, ব্রত, উপবাস এবং তপস্যায় যাহার পুষ্টি, যাহা একান্তরূপে ভোগলালসাবিবর্জ্জিত, বাঞ্ছিতের ইষ্টই যাহার উপাসনা, যাহা অবশেষে মৃত্যুর বিভীষিকাকেও কল্যাণের অমৃতে পরিণত করিতে পারিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া তরুণ লেখক প্রচলিত উপন্যাস গুলির ভাষা, ছন্দ ও একঘেয়ে সুর পরিহার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি এই পথ অবলম্বন করিয়া যশস্বী হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। মূল অখ্যায়িকাকে উপলক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় নীতিকথা ও সুলভ পরিহাসরসের অবতারণা করিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আমরা তাহার পক্ষপাতী হইতে পারি নাই। কিন্তু তরুণ লেখকের এই ক্রটী সত্ত্বেও, তিনি সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীটী অতি উপাদেয় করিয়াছেন। আমরা আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত পুস্তক খানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ শেষ করিয়া ইহার পবিত্র প্রভাব অনুভব করিয়াছি।

সাবিত্রীর পরিণীত জীবন আমরা সর্ব্বদাই একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পাইতেছি। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিতেন, এক বৎসর পরে তিনি স্বামীকে হারাইবেন। এই জন্য তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদা পাতি-ব্রত্যের এক পবিত্র তপস্যার মধ্যে পাইতেছি; গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণ ভাবের মধ্যে তিনি এক দিনও ধরা

সাবিত্রী-সত্যবান
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

দেন নাই; ভাবী আশঙ্কায় প্রিয়তম স্বামী তাঁহার নিকট আরও কত বেশী প্রিয় হইয়াছিলেন, দুঃখময় বন্য জীবন সেই আশঙ্কায় তাঁহার কত তৃপ্তিকর হইয়াছিল ও তাঁহার করশোভী শঙ্খদ্বয়ের মূল্য তাঁহার চক্ষে কত বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। এইজন্যই সাবিত্রী দাম্পত্য-ধর্ম্মের এরূপ বিশেষ ব্রত ধারণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, এই খানেই তাঁহার বিশেষত্ব।

সাবিত্রীর উপাখ্যান এদেশে বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ বেদের সময় হইতে এই উপাখ্যান ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চলিয়া আসিয়াছে। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা স্বয়ং সাবিত্রীর সমকক্ষা বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট গর্ব্ব করিতেছেন—

"দ্যুমৎসেন সুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি।"—অযোধ্যা।

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে আমাদের মহিলা-গণ সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকটে পত্র লিখিবার সময় এখনও সচরাচর "সাবিত্রীকল্পা" পাঠ লিখিত হইয়া থাকে; আমাদের ঘরে ঘরে এখনও সাবিত্রীর নাম প্রতিধ্বনিত। ভারতে সাবিত্রী একনিষ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের নামান্তর মাত্র, বক্তৃতার দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা ও বেণের দোকানের রং কিনিয়া অমূল্য হীরাকে রঞ্জিত করিতে যাওয়া—উভয়ই পণ্ডশ্রম মাত্র। হীরাকে পরিষ্কার করিয়া তাহার স্বরূপ প্রদর্শন

করিতে পারিলেই যথেষ্ট ; গ্রন্থকার মূল উপাখ্যানে তাহা করিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিয়া সুখী হইয়াছি। পরিশিষ্টে রং ফলাইবার চেষ্টার আর দরকার ছিল না। মহাভারত, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে সাবিত্রীর উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

১৯ নং কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

নানা বিপদাপদ ও দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া সাবিত্রী-সত্যবান্ বাহির হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এমন কষ্ট নাই, যাহা না ভুগিয়াছি, এমন বিপদ নাই, যাহাতে না পড়িয়াছি, এমন মনোদুঃখ নাই, যাহা সহ্য করি নাই। কিন্তু তবু এই সব অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সাবিত্রী-সত্যবান্ বাহির হইল—ইহাই আমার আনন্দের বিষয়।

গ্রন্থখানি অনেক দিন হইল লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম উদ্যোগেই আমার শান্তিময় গৃহ মৃত্যুর তাড়নায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। চিত্রগুপ্তের ক্রমাগত তলবে আমার জীবনের প্রধান প্রধান অবলম্বনগুলি একে একে অপসারিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নানা-রূপ শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক বিপত্তিও এক-কালে আমায় আক্রমণ করে। সেই দুর্দ্দিনে যদি আমি দুইটি সহৃদয় ব্যক্তির মুক্তহস্ত সাহায্য না পাইতাম, তবে হয়ত এই গ্রন্থ প্রকাশের আশা একবারেই আমায় পরিত্যাগ করিতে হইত। আমার সেই সহৃদয় হিতৈষী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন, আমার গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু, অপরটী বঙ্গের বর্ত্তমান খ্যাতিমান্ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। এই উভয় ব্যক্তিই যথা

সময়ে আমায় বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য প্রদান করিয়া একসঙ্গে আমার নিরানন্দ হৃদয়ে এক উৎসাহের প্রদীপ জ্বালিয়া দেন। হরিদাস বাবু অকাতরে গ্রন্থের ব্যয়-ভার বহন করিতে আরম্ভ করেন; দীনেশ বাবু গ্রন্থখানির প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক উহার ভূমিকা লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। বলা বাহুল্য, এই উভয় কার্য্যই আমার গ্রন্থখানির মূল্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। দীনেশ বাবুর ভূমিকারূপ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গ্রন্থখানি বাহির হইল—ইহা যে আমার গ্রন্থের পক্ষে কতদুর সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিদান শুধু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে হইতে পারে না।

তিনি তাঁহার ভূমিকায়, গ্রন্থের কোথাও কোথাও কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় নীতিকথার ও পরিহাস-রসের অবতারণা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নৈতিক বক্তৃতার বাড়াবাড়িতে যে গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তাহা জানি, কিন্তু তথাপি আমি ঐ ত্রুটী পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। হিন্দুরমণীকুলের মধ্যে সাবিত্রী-কাহিনী না জানেন, এমন নারী খুব কমই আছেন। আমার উদ্দেশ্য, সেই কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে, কি জন্য সাবিত্রী এত শ্রেষ্ঠা, তাহাও একটু বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা এবং এই উপায়ে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাবিত্রী-কল্পা করিয়া তোলা। গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগটীও সেই

উদ্দেশ্যেই লিখিত, তবে উহা একটু অধিক শিক্ষিতা রমণীদের জন্য। যে উদ্দেশ্যে ৺চন্দ্রনাথ বাবুর "সাবিত্রী-তত্ত্ব" লিখিত, যে উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ভারত-মহিলা" লিখিত, "সাবিত্রী-সত্যবানের" পরিশিষ্টটীও সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। তবে অবশ্যই আমি সেই সকল কৃতী লেখকের যোগ্যতা বা উদ্দেশ্যসাধনশক্তি পাই নাই। দীনেশ বাবু পরিশিষ্ট-ভাগটী পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে, তাঁহার উপদেশ লইয়া যথাকর্ত্তব্য করিব।

তারিখ, ১লা আশ্বিন,
১৩১৭ সাল।
কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

—:•:—

আনন্দের বিষয় যে অতি অল্পকালের মধ্যে "সাবিত্রী-সত্যবানের" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এই সংস্করণে পুস্তক খানি যাহাতে আরও মনোরম হয়, আরও চিত্তাকর্ষক হয়, প্রকাশক মহাশয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এইবার অনেক অনাবশ্যক ও দৃষ্টিকটু অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, অনেক সুন্দর ও সুশ্রী চিত্র তৎপরিবর্ত্তে সংযোজিত হইয়াছে। আশা করি এইবার গ্রন্থখানি আরও মনোরঞ্জন করিবে।

তারিখ, ১লা বৈশাখ,
১৩১৮ সাল।
কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

সাবিত্রীর স্মরণে
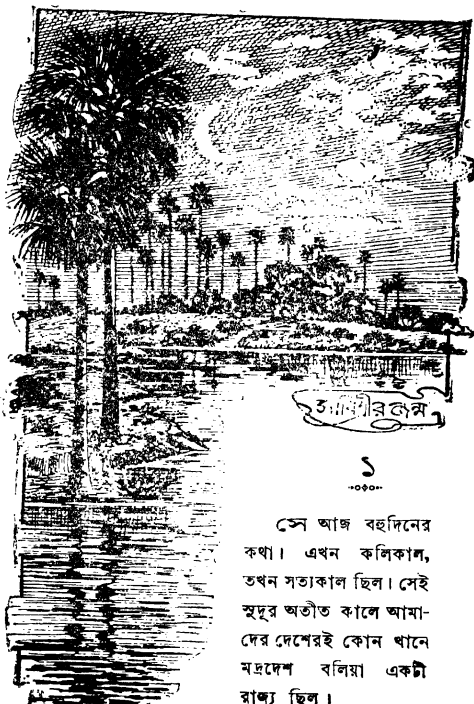
১

সে আজ বহুদিনের কথা। এখন কলিকাল, তখন সত্যকাল ছিল। সেই সুদূর অতীত কালে আমাদের দেশেরই কোন খানে মদ্রদেশ বলিয়া একটী রাজ্য ছিল।

এই মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে একজন পরম ধার্ম্মিক নরপতি রাজত্ব করিতেন।

সত্যকালে যে, দেশের অবস্থা কি মনোরম ছিল, তাহা আমি তোমাদিগকে সম্যক্ বুঝাইতে পারিব না। এখন আর সে মদ্রদেশ নাই, তাহার সে ধনধান্য-শোভিত অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদও নাই। সে কালের কোনও ধারণা করিতে হইলে এখন আমা-দিগকে কল্পনা-দেবীকে আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু সে এমনি দূর যে, এই ক্ষিপ্রগামিনী দেবীটীও সেখানে খুব কচিৎই ঢুকিতে পারেন; আর ঢুকিতে পারিলেও প্রায় সকল সময় সকল খবর লইয়া আসিতে পারেন না। কখনও বা সামান্য কিছু লইয়া, কখনও বা রিক্ত হস্তেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং তৎ-সাহায্যেও এখন আর আমাদের সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার ক্ষমতা নাই।

তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া, কিম্বদন্তী শুনিয়া ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া আমরা এ সম্বন্ধে দু'চারটী কথা জানিতে পারি বটে। আমি সেই দুই চারিটী কথাই আজ তোমাদিগকে উপহার দিব। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া আজ আমরা এই বুঝি যে, তখন

দেশের চারিদিকে যাহা কিছু ছিল, সকলই বড় সুন্দর ছিল। আমি যে এখানে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথাই কহিতেছি—তাহা নহে। সেকালে লোকের আচার-ব্যবহার, রূপ-গুণ, চরিত্র—সকলই সুন্দর ছিল। তখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আকাশ, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, যাহা কিছু ছিল, সকলই সুন্দর দেখাইত। তখন মানুষে সুন্দর সত্য ব্যবহার করিত, সকলে সুন্দর সত্য কথা কহিত, সর্ব্বত্র সুন্দর রৌদ্র-বৃষ্টি হইত, পশু-পক্ষীরা সুন্দর নির্ভয়ে খেলিয়া বেড়াইত। মানুষ তাহাদিগকে হিংসা করিত না; তাহারাও মানুষকে হিংসা কিম্বা ভয় করিত না, বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও কখনও হিংসা-বিবাদ দৃষ্ট হইত না। মানুষ সিংহের সহিত একত্রে সুন্দর খেলা করিত, সর্প ভেকের সহিত সুন্দর ক্রীড়া করিত, মেষশাবক বাঘিনীর বুকের দুধ সুন্দর টানিয়া খাইত। ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য ফলিত, আকাশ-পথে মুনি-ঋষিদের যজ্ঞের ধূম সুন্দর উত্থিত হইত। তখন সকলই সুন্দর ছিল।

মদ্রদেশও অবশ্য এইরূপ শোভা-সম্পদে বিভূষিত ছিল। একে সত্যকালের রাজ্য, তাহাতে আবার এইরূপ পরম ধার্ম্মিক রাজার দেশ—এই দেশে কাহারও কোনও অসুখ

ছিল না, সকলেই পরম সুখে বাস করিত, সকলেই নিরাপদে ছিল।

মদ্রদেশে কৃষকেরা মনের সুখে হাল চালাইত, গৃহস্থেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া নিরাপদে বাস করিত, ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিত্য বেদপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন, মুনিঋষিরাও সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে, নিরাতঙ্কে যাগযজ্ঞাদি করিতেন। মদ্রদেশের দিনগুলি এইরূপ পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি বুঝি ঈশ্বরের রাজ্যে নাই, বোধ হয় সেটা তাঁহারই অনভিপ্রেত—তাই মদ্রদেশেরও সকল সুখ-সম্পদের মধ্যে একটা অভাব ছিল। মদ্রদেশে সকলই ছিল, কিন্তু রাজার সন্তান ছিল না। রাজ্যের রাজা-প্রজা সেই এক দুঃখে বড় কাতর থাকিত।

দুঃখী-দরিদ্রের সন্তান না হইলে বড় কিছু আসে যায় না, কিন্তু অবস্থাপন্নের সন্তান না হইলে বড় বিপদ! তাঁহাদের সম্পত্তি ভোগ করে কে? অশ্বপতিরও এজন্য বড় কষ্ট ছিল। এমন সুন্দর রাজ্য, এমন সুন্দর প্রজা, এমন উচ্চ বংশ-গৌরব—ইহাদের উত্তরাধিকারী নাই!—বড় পরিতাপ! অশ্বপতি এই

পরিতাপে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁহার মন দিন দিন ক্লিষ্ট হইত।

বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে রাজা একদিন একটী বিরাট সভা করিলেন। সেই সভায় রাজ্যের যত বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও প্রধান প্রধান মুনি-ঋষিরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, "আপনাদের ডাকিয়াছি একটা গুরুতর পরামর্শের জন্যে। আমি ক্রমে বৃদ্ধ হইতেছি; আর কতদিনই বা বাঁচিব? এই বেলা রাজ্যের একটা উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা উচিত। এখনও সন্তান হইল না, আর যে কখনও হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না; এখন এই রাজ্যের ভার কাহার উপরে দিয়া যাইব, বলুন? আমার সোনার রাজ্যটা একটা অধিকারীর অভাবে একবারে ছারখারে যাইবে—ইহা আমি ভাবিতে পারি না।"

রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মুনি-ঋষিদের বড় কষ্ট হইল। মুনি-ঋষিরা নানা তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহারা ইহার কি প্রতিকার হইতে পারে, সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা অবশেষে একটা সুপরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহারা

কহিলেন, "মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি? আপনার এ রাজ্যের অধিকারী যে সে হইতে পারে না। একমাত্র আপনার পুত্রই এর ন্যায্য ও উপযুক্ত অধিকারী। আপনি যাগ-যজ্ঞ করুন, তপস্যা করুন—নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে।"

আর যে কখনও সন্তান হইবে এ কথা অশ্বপতি স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারেন নাই—এখন মুনি-ঋষিদের এই কথা শুনিয়া বড় উল্লসিত হইলেন। মুনি-ঋষিদের কথা অব্যর্থ—তিনি এমত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের এই কথায় এইক্ষণ তাঁহার মনে একটী আশার প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। অশ্বপতি পরম অহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—

"অনুমতি করুন, কাহার তপস্যা করিব। রাজ্য-রক্ষা, বংশ-রক্ষা ও প্রজা-রক্ষার নিমিত্ত আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।"

তখন সেই তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া তাঁহাকে সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সাবিত্রী দেবী বিধাতার একান্ত প্রিয়-পাত্রী; তিনি সন্তুষ্ট হইলে, বিধাতাও সন্তুষ্ট হইতে পারেন; আর স্বয়ং বিধাতা ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার

বিধানেরও খণ্ডন হইতে পারে,—তাঁহারা তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া যার যার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজাও সেই দিন হইতে তপস্যায় যাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

২

রাজা তপস্যার্থ বনে যাইবেন,——মদ্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এই কথা শুনিল। শুনিয়া তাহারা বড় দুঃখিত হইল। রাজার সিংহাসনটী কতক কালের জন্য খালি পড়িয়া থাকিবে,—পিতৃসম প্রতিপালক কতক কালের জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহাদের অন্তর বড় ব্যথিত হইল। কিন্তু রাজার একটী পুত্র সন্তান হয়, সকলেরই সেই ইচ্ছা। সুতরাং অতি কষ্ট হইলেও কেহই তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিলেন না। দুঃখিত মনে, সাশ্রু নয়নে যার যার

অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া বিদায় দিলেন। রাজাও সকলকে বুঝাইয়া শুনাইয়া, শান্ত করিয়া, অঞ্চলে রাণীর চক্ষুর জল মুছাইয়া একদিন বনে চলিয়া গেলেন।

বনে যাইয়া অশ্বপতি বড় ভীষণ তপস্যাই করিতে লাগিলেন। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়নাভ্যস্ত রাজা তৃণশয্যায় বসিয়া দিন নাই, রাত্রি নাই, সেই ঘোর বনে অতি কঠোর তপস্যাই করিতে লাগিলেন। তা'র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত তিনি আবার যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিয়া এত আহুতির উপর আহুতি দিতে লাগিলেন যে তাহাতে বনভূমি উজ্জ্বলালোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একদিন নয়, দু'দিন নয়, এক বৎসর নয়, দু'বৎসর নয়, অশ্বপতি ক্রমান্বয়ে আঠার বৎসর কাল এইরূপ সাধনা করিলেন। ক্রমে তাঁহার তপস্যার চোটে চরাচর কম্পিত হইয়া উঠিল; যজ্ঞের পর যজ্ঞের ধূমে দেবলোকটী আঁধার হইয়া গেল; দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব—সকলেই তাঁহার কঠোর সাধনা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

কাহাকেও কঠোর তপস্যা করিতে দেখিলে দেবতারা বড় ভয় পাইতেন—দেবতাদিগের এ পৌরুষটুকু আছে! যাঁহারা কালিদাসের শকুন্তলা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই

একথাটা অবগত আছেন। অশ্বপতিকে এই ভীষণ তপস্যা করিতে দেখিয়াও আজ তাঁহাদের অন্তর বড় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ! এবার না জানি অশ্বপতি কাহার অধিকারই কাড়িয়া লইতে আসিয়াছেন! তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারের চিন্তায় আকুল হইলেন। ইন্দ্র একে দেবরাজ, তা'তে আবার শতক্রতু—তিনি আপন মানসম্ভ্রমের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যম—যাঁহার উপর মানুষের বড় রাগ; তাঁহার উপর তাহাদের যত রাগ, তত আর কাহার উপর?—তিনি আপন ধর্ম্মাধিকরণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুবের ধনভাণ্ডারের অধিপতি—মানুষের মত অর্থগত-প্রাণ আর কে?—তিনি তাঁহার ধনভাণ্ডার কি করিয়া রক্ষা করিবেন, সে কথাই ভাবিতে লাগিলেন। চন্দ্র অপূর্ব্ব সুধার ভাণ্ডার লইয়া বসিয়াছেন—মানুষেরা সময়ে অসময়ে তাঁহার এই সুধার ভাণ্ডটী লইয়া বড় টানাটানি করে! তিনি উহাই হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ পবন, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর অধিকারের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বিচার করিলেন, অশ্বপতি যখন এমন তপস্যা করিতেছে,

তখন বিধাতাকে সন্তুষ্ট না করিয়া যায় না। আর বিধাতা ঠাকুরও যদি একবার সন্তুষ্ট হন, তবে তিনিও তাহাকে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির বর প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! বিধাতা সন্তুষ্ট হইলে, তিনি যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ বর দিতে পারেন—দেবতারা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। তিনি যে কর্ম্মফলের হিসাবেই প্রত্যেককে সুখ-দুঃখের অধিকারী করেন, তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে যে কিছুই হয় না—তাঁহারা এ কথাটা বুঝিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, তিনি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া যখন যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়া দিয়া আইসেন, তাহাই হয়। ইহার উপরে কাহারও কোনও হাত নাই, কাহারও কোনও কথা কহিবারও নাই। সুতরাং এই বিপদে তাঁহারা আজ বিধাতার শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। বিধাতা যদি তাঁহাদের অনুরোধে পড়িয়া এই যাত্রা অশ্বপতিকে কোনও রূপ বর-প্রদান না করেন, তবেই তাঁহাদিগের মান-সম্মান বজায় থাকিতে পারে; নতুবা আর উপায় নাই। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দিনই স্বদলবলে বিধাতার দরবারে উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে বসিয়া নানা বেদগান শ্রবণ করিতেছেন, চারিদিকে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণ জাঁক করিয়া বসিয়াছেন; কাহারও হাতে বীণা, কাহারও হাতে তানপুরা, কাহারও হাতে পাখোয়াজ, কাহারও হাতে সারঙ্গ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি শোভা পাইতেছে—চারিদিকে খুব মজলিস চলিতেছে—একটা সুরের তরঙ্গে যেন জগৎ স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে—এমন সময় দেবগণ যাইয়া সেইখানে উপস্থিত! ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মলিন মুখ, বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। দেবতারা একে একে সকল কথা ভাঙ্গিয়া কহিলেন।

দেবতাদের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বড় আশ্চর্য্য হইলেন। মনে মনে কহিলেন, দেবতারা বড় মূর্খ হইয়াছে। যার যার কর্ম্মফলেই প্রত্যেকে সুখ-দুঃখ ভোগ করে—আমরা তাহাদের কে? আমরা তো উপলক্ষ মাত্র! প্রকাশ্যে কহিলেন—"তোমরা এত চিন্তিত হইয়াছ কেন? অশ্বপতি তপস্যা করিতেছে—ইহার অন্য কারণ আছে। এক জন তপস্যা করিতেছে বলিয়াই যে, তোমাদের অধিকার কাড়িয়া লইতে আসিতেছে—এ কথা তোমাদিগকে কে বলিল? অশ্বপতির অভাব কি? ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের তুল্য তাহার ঐশ্বর্য্য, কুবেরের ভাণ্ডারের তুল্য তাহার রত্ন-

ভাণ্ডার, আর যাহার এমন তপস্যার জোর তাহার যমের যমত্ব নিয়ে দরকার ?”

বিধাতার কথা শুনিয়া দেবতাদের একটু অপ্রস্তুত হইতে হইল। অপ্রস্তুত হইবারই কথা! অত করিয়া তাঁহারা কখনও কথাটার বিচার করেন নাই! কিন্তু কথাটা সকলের নিকটে যেমনই লাগুক্, যমের নিকটে বড় শ্রুতিমধুর বোধ হইল না। অশ্বপতির ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের তুল্য, তাই হয়ত তাহার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বে অনাবশ্যক; অশ্বপতির রত্নভাণ্ডার কুবের ভাণ্ডারের সমতুল, তাই হয়ত তাহার কুবের-ভাণ্ডারে নিস্প্রয়োজন; কিন্তু যমের যমত্বের তুল্য তাহার তো এমন কিছুই নাই—তবে তাহার যমত্বে স্পৃহা নাই কেন? যম কি তবে এতই হীন? যমের এ কথায় বড় অভিমান হইল। তিনি কহিলেন, “প্রভু, আমরা কি তবে এতই হীন? আমি চরাচরের লয়কর্ত্তা, তা'তে আবার স্বয়ং ধর্ম্মরাজ! আমার অধিকারটাও কি মানুষের লোভনীয় নহে?”

বিধাতা ধর্ম্মরাজের অন্তরের গুহ্য ভাবটী বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে একটু হাসিয়া কহিলেন, “এ ভুল বড় ভুল—ইহা ভাঙ্গিতে হইবে।” প্রকাশ্যে কহিলেন, “তোমার অধিকারটা এমনই কি বড়? তুমি কি

নিজ ইচ্ছাতেই চরাচরের লয় সাধন কর্ত্তে পার, না কখনো কাহাকেও নিজ ক্ষমতায় সুখী-দুঃখী করিয়াছ ?”

যম আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিলেন, “আমার ইচ্ছায় না করিয়া থাকি, অন্ততঃ তোমার ইচ্ছায় তো করিতেছি ! সে ক্ষমতাটাই কম কি ? তাহাই বা কয় জন মানবের আছে ?”

ব্রহ্মা হাসিয়া কহিলেন, “ভুল, ভুল, ধর্ম্মরাজ, সকলই ভুল ! এ তোমার ইচ্ছায়ও নয়, আমার ইচ্ছায়ও নয়। তুমি আমি উপলক্ষ্য মাত্র ! মানুষের সুখ-দুঃখ সকলই মানুষেই গড়িতেছে, মানুষেই ভাঙ্গিতেছে। তুমি আমি সকলের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিতেছি বটে, কিন্তু সে আমাদের ইচ্ছানুসারেই নয়—যার যার কর্ম্মফলের হিসাবে। যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে, আমিও তাহাকে তেমনিই ফল দিতেছি—তাহার ললাটে তেমনই অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দিয়া আসিতেছি, আর তোমরাও কেবল সেই কর্ম্মোপার্জ্জিত অদৃষ্টের বিধান রক্ষা করিয়াই যার যার কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মাত্র। দেবগণ, এ কথাটা এবার ভাল করিয়া শিখিয়া রাখ।”

দেবতারা বড় আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা এরূপ কথা আর কখনও শুনেন নাই—শুনিয়া বিস্মিতভাবে

কহিলেন, "তবে এই কর্ম্মফলে তোমার বিধানেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে ?"

বিধাতা কহিলেন, "পারিবে না কেন ? অবশ্য পারে। তবে কার্য্যানুযায়ী তেমন উচ্চ সাধনা চাই। তা' না হইলে হইবে কেন ?"

দেবতারা বিস্মিত নেত্রে, অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে কেবল কহিলেন, "আশ্চর্য্য ! আমরা এই কথাটা আর কখনও শুনি নাই। আজ এইমাত্র নূতন শুনিলাম।"

বিধাতা কহিলেন—"আমার কথাটা যত না আশ্চর্য্য, তোমরা যে এ কথাটা এতাবৎ আর কখনও শোন নাই—তাহা ততোধিক আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আচ্ছা, সে কথা এখন যাক্—তোমরা যদি এ কথাটা আর কখনও না শুনিয়াই থাক, তবে শীঘ্রই যাহাতে একবার ভাল করিয়া শুনিতে পাও, আমি সে ব্যবস্থা করিব। এখন তোমরা এস। অশ্বপতি তপস্যা করিতেছে, একটী সন্তান লাভের জন্য। সুতরাং সে জন্য তোমাদের চিন্তিত হইবার কারণ নাই—এ জন্য ভয় পাইও না। অশ্বপতির সাধনা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—শীঘ্রই সে নিরস্ত হইবে। এখন তোমরা যাইয়া যার যার ঘরে কাজ দেখ।"

দেবগণ তখন হৃষ্টচিত্তে বিধাতার মন্দির হইতে বিদায়

গ্রহণ করিয়া যার যার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে রাস্তায় রাস্তায় তাঁহারা বিধাতার এই নূতন কথাগুলি অনেকবার আলোচনা করিলেন।

দেবগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, বিধাতা সাবিত্রী দেবীকে স্মরণ করিলেন। দেবী স্মরণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিধাতা কহিলেন, "দেবি, অশ্বপতি নাকি আজ আঠার বৎসরকাল ক্রমাগত তপস্যা করিতেছে; তুমি তাহাকে এখনও দেখা দাও নাই?"

দেবী কহিলেন, "প্রভু, দেখা দিব কি? সে পথ তো আপনিই বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অশ্বপতি তপস্যা করিতেছে, সন্তান লাভের জন্য। আপনি তো তাহাকে জন্মের ষষ্ঠদিবসেই নিঃসন্তান বলিয়া লিখিয়া দিয়া আসিয়াছেন! তবে আর এখন যাইয়া আমি কি করিব?"

ব্রহ্মা দেখিলেন, সকল দেবতার যে ভুল, সাবিত্রী দেবীরও সেই ভুল। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা যাও, অশ্বপতি এতদিন নিঃসন্তান ছিল বটে, কিন্তু এখন আমি তাহাকে সন্তানবান্ করিলাম। অবিলম্বেই তাহার একটী কন্যা-সন্তান জন্মিবে। তুমি এখনই যাইয়া এই শুভ সংবাদটী তাহাকে প্রদান করিয়া আইস। আর

বলিয়া আইস যে, আর তাহার তপস্যার প্রয়োজন নাই।”

অশ্বপতি পুত্রার্থে তপস্যা করিতেছেন, পুত্রের অভাবে তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইতেছে, কিন্তু বিধাতা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে একটী কন্যা সন্তান দিলেন! এ কেমন ব্যবস্থা হইল? সাবিত্রী দেবী এ কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না; কহিলেন, “কন্যা! কন্যা কেন, প্রভু? সে যে পুত্রার্থী! পুত্র-বিহনে মদ্রদেশ রাজশূন্য হইতে বসিয়াছে! সে কন্যা লইয়া কি করিবে?”

ব্রহ্মা কহিলেন, “ক্ষতি কি? এই কন্যা হইতেই যাহাতে তাহার শত পুত্রের কার্য্য হয়, আমি সে চেষ্টা করিব।”

তখন সাবিত্রী দেবী মর্ত্ত্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু যাইবার কালে তিনি আর একটা প্রশ্ন না করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন, বিধাতার আদেশের ব্যতিক্রম হয় না। অশ্বপতি তো বিধাতার আদেশেই সন্তানহীন। তবে আজ তাহার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে কেন? তিনি যাইবার সময় সেই কথাটা বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন।

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া প্রজাপতি কহিলেন, “দেখ,

তোমরা দেবতা হইয়াও এই কথাটা বোঝ না, এইটা বড় কলঙ্ক! আমি এবার তোমাদের এ কলঙ্কটা নিশ্চয় দূর করিব। কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের সৃষ্টি, কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের বিনাশ। আমি কে? আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু লোকে, এমন কি দেবতারাও এমনি অন্ধ যে, আজকাল এ কথাটা মোটেই বুঝে না—তাই চারিদিকে এত সব অনর্থ ঘটিতেছে। কিছু না কিছু বিপদাপদ হইলেই মানুষেরা মনে করিতেছে, এ বিধাতারই কাণ্ড—বিধাতাই এজন্য দায়ী; আর দেবতারাও সর্ব্বদা মনে মনে অহঙ্কার করিতেছেন, আমিই লোকের যত ভাল-মন্দের কর্ত্তা; আমি যখন আছি, তখন তাহাদের আর চিন্তা কি? সকলেই যে নিজ নিজ অদৃষ্ট নিজ নিজ কর্ম্মফলে গড়িয়া লইতেছেন, তাহা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। ফলে লোকগুলি দিন দিন অলস, অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অশ্বপতি পূর্ব্বজন্মফলে নিঃসন্তান হইলেও দেখ এই তপঃপ্রভাবে এইক্ষণ সন্তানবান্ হইবার যোগ্য হইয়াছেন। সুতরাং এখন তাহাকে আমি সন্তানবান্ করিতে পারি। কিন্তু ইহা দেখিয়া ইহাই বোঝা উচিত নহে যে, আমি অনুগ্রহ করিয়াই তাহাকে তাহার অদৃষ্টের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতেছি। তাহা

হইলে ঈশ্বরের ন্যায় বিধানের প্রতিই কটাক্ষপাত করা হয়। আশা করি, এ কথাটা এখন হইতে তোমরা বেশ মনে রাখিবে।"

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সাবিত্রী দেবীও অন্যান্য দেবতার ন্যায় অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি চুপ করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, "তবে তো এটা ভারি ভ্রম! সকলকেই তো তা হ'লে এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।"

ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়। না হইলে সৃষ্টিটাই মাটী হইবে। আমিও সেই কথাটাই এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম। আর দেখ সেজন্যই আজ আমি অশ্বপতিকে সন্তানবান্ করিয়াও পুত্র দেই নাই, একটী কন্যা-সন্তান মাত্র দিয়াছি। আমার ভরসা আছে, এই কন্যা-সন্তান হইতেই উভয় লোকে অবিলম্বে এ কথাটার প্রচার হইবে।"

তখন সাবিত্রী দেবী বুঝিলেন, এই কন্যা-দান-ব্যাপারটার মধ্যে বিধাতার একটা কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। তখন তিনি হৃষ্ট মনে, প্রফুল্ল বদনে, প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বিধাতার দরবার হইতে মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিলেন।

অশ্বপতির বরগ্রহণ।

The Emerald Printing Works,

তোমার মঙ্গলের জন্যই বিধাতা এ বিধান করিয়াছেন, জানিও।”

বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইয়া চলিয়া গেলেন। অশ্বপতি অতঃপর আর তাঁহাকে একটীবারও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার নিকট আর একটীমাত্র কথা কহিবারও সুযোগ পাইলেন না। তখন অগত্যা সেই দেবদত্ত আশীর্ব্বাদই মস্তকে ধারণ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন, রাজার সন্তান হইবে, জানিতে পারিয়া প্রজারা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মদ্রদেশ আবার জয়-জয়কারে ভরিয়া গেল।

৩

তার পর দেবতার আশীর্ব্বাদ ফলিল। দেবতার আশীর্ব্বাদ কখনও বিফলে যায় না। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই রাজ্যে শুভ সংবাদ প্রচারিত হইল—রাজ্ঞী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন। মদ্রদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

ক্রমে কয়েক মাস অতীত হইলে, যথাসময়ে রাজমহিষী একটী অপূর্ব্বা সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিলেন। দেবতাদিগের দেহে যেমন নানা শুভ লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, জন্মমাত্র সেই কন্যার দেহেও সেইরূপ নানা শুভ লক্ষণাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে মুহূর্ত্তে এই অপূর্ব্ব শিশু মৃত্তিকা

স্পর্শ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই ধরণী যেন এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিলেন, কন্যার চতুর্দ্দিকে কি এক উজ্জ্বলালোক-প্রভা যেন এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিল; স্বর্গীয় বীণাধ্বনিবৎ এক চারু মঙ্গলবাদ্য যেন হঠাৎ প্রসূতির কর্ণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; মহারাজ অশ্বপতি ও রাজ্ঞী মালবী দেবী যেন একরাশি নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া হঠাৎ এক স্বর্গীয় ভাবে অভিভূত হইয়া গেলেন।

সেই দিন মদ্রদেশের কি আনন্দের দিন! দেবতার পীঠে পীঠে, মন্দিরে মন্দিরে, পূজা হইতে লাগিল; রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পুষ্পমাল্য সকল বায়ুভরে দুলিতে লাগিল; নগরের তোরণে তোরণে, রাজপথে রাজপথে, মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত হইতে লাগিল। নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনায় সেই দিন অশ্বপতি অনেক দান-ধর্ম্ম করিলেন। গরীব-দুঃখীদের সে দিন আর আনন্দের সীমা রহিল না—বস্ত্র, তণ্ডুল ও থালা-ঘটি-বাটীতে তাহাদের গৃহ পূরিয়া গেল। ছোট ছোট ছেলেদের সন্দেশ খাইতে খাইতে অসুখ করিল। আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মুটের উপর মুটে বোঝাই করিয়াও সকলগুলি দানের জিনিস গৃহে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। চারিদিকে একটা তুমুল উৎসব চলিল।

অশ্বপতির কন্যা হইয়াছে, এ সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে দলে দলে লোক রাজকুমারীকে দেখিতে আসিতে লাগিল। দূর, দূর, বহু দূর হইতেও রাজ-কন্যাকে দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিল। ব্রাহ্মণগণ ও মুনিঋষিরা আসিয়া সুলক্ষণা কন্যাকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও ধনিব্যক্তিগণ আসিয়া নানা ধনরত্নাদি যৌতুকে মহা-রাজ-কুমারীর সংবর্দ্ধনা করিলেন। মধ্যবিত্ত ও গরীব প্রজাগণ কেবল শুধু হাতে আসিয়াই রাজবাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জয়-জয়কার ধ্বনিতে কম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের সে অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ রাজভক্তির নিকটে অশ্বপতির বিপুল উৎসাহের ঘটাও বুঝি ম্লান হইয়া গেল!

তাহার খোঁজ-খবরই পাইলেন না। অশ্বপতি-দুহিতা ক্রমে বাল্য ছাড়িয়া কৈশোরে আসিয়া পদার্পণ করিলেন।

সাবিত্রীদেবীর কৃপায় কন্যা-লাভ হইয়াছে, অশ্বপতি কন্যার নাম রাখিলেন—সাবিত্রী! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর রূপ-গুণও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সাবিত্রীর সোণার মত সুন্দর রং ক্রমে জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত চোক্‌-দু'টী ধীর গম্ভীর হইয়া পবিত্রতার আকরস্বরূপ হইল। মাথার চুলগুলি বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে বাঁকিয়া বাঁকিয়া ফণিনীর মত তাঁহার মুখপদ্মটীকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল। আর তাঁহার দীর্ঘ ক্ষীণ তনুখানি সেই মুখপদ্মভরে বাতাসের মুখে মৃণালের মত উঠিতে বসিতেই আন্দোলিত হইতে লাগিল।

সাবিত্রীর অন্তরের সৌন্দর্য্যও সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ফুটিয়া উঠিল। যে একবার তাঁহাকে দেখিল, তাঁহার দু'টী কথা শুনিল, সেই বুঝিল, তাঁহার এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তাঁহার ভিতরের সৌন্দর্য্যেরই একটা প্রতিকৃতি মাত্র! সাবিত্রী ক্রমে খেলা ছাড়িয়া কর্ম্ম ধরিল; ধূলাখেলার পরিবর্ত্তে ব্রত-পূজাদি আরম্ভ করিল, এবং গরীব-দুঃখীদের সেবা-শুশ্রূষায় চিত্ত-প্রাণ সমর্পণ করিল।

সাবিত্রীর এই পরিবর্ত্তন ক্রমে অশ্বপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বালিকা সাবিত্রী ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিয়া দিন দিন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিতেছে, অশ্বপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রীর পাত্রান্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অশ্বপতি মনে করিলেন, "আমার একমাত্র কন্যা, তা'তে আবার এই কন্যা রূপে-গুণে এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী,—এই কন্যাকে আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষ-রত্নেই সমর্পণ করিব—যার তার হাতে ফেলিয়া দিতে পারিব না।" তিনি এই ভাবিয়া দেশে দেশে ভাট পাঠাইলেন, নগরে নগরে ঢোল পিটাইয়া দিলেন, নানা স্থানের নানা পাত্রের দোষ-গুণ অন্বেষণের নিমিত্ত নানা ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, অসংখ্য গুপ্তচর এই জন্য নিযুক্ত হইল। দূতেরা সব নিমন্ত্রণ-চিঠি লইয়া দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এত করিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। বিধাতার ইচ্ছা বোঝা ভার, এত চেষ্টা করিয়াও অশ্বপতি সাবিত্রীর একটী উপযুক্ত বর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কাণা-খোঁড়ারও বিবাহ হয়, কিন্তু সাবিত্রীর বিবাহ লইয়া মস্ত গোলযোগ বাঁধিল। সাবিত্রীর

সকল গুণ গ্রামের মধ্যে একটা দোষ বড় দোষ—সাবিত্রী বড় রূপবতী! সে রূপের ছটা মানুষের চক্ষে সয় না। যে তাঁহার দিকে চাহে, তাহারই চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সকলেই তাঁহাকে দেবী ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে সরিয়া পড়ে। কত রাজা আসিল, রাজপুত্র আসিল, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আসিল, কিন্তু সাবিত্রীর দিকে প্রণয়দৃষ্টিতে চাহিতে কাহারও চক্ষু উঠিল না।

সাবিত্রী অপরূপ রূপসী, এ কথা তাঁহারা সকলেই শুনিয়াছিলেন; আর শুনিয়াছিলেন বলিয়াই এত জাঁকজমক করিয়া আসিয়াছিলেন—কিন্তু এই রূপের মধ্যে যে এমন একটা বিদ্যুতের তীব্রতা ছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এখন সেই তীব্রতা দেখিয়া তাঁহাদের চোক ধাঁধিয়া গেল, মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসিল, সাবিত্রীর অপূর্ব্ববালিকামূর্ত্তিতে তাঁহারা এক অপূর্ব্বদেবীমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত অন্তরে যার যার রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। অতি গর্জ্জনে অতি লঘু বর্ষণ হইল।

ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। এত বড় কথা প্রায় গোপনে থাকে না। দেবতার বরে অশ্বপতির গৃহে কোনও স্বর্গের দেবী আসিয়া স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন—এ কথাটা দেখিতে দেখিতে রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িল।

সকলেই শুনিল, রাজকন্যার মুখের দিকে যে চায়, তারই চক্ষু ঝলসিয়া পড়ে, তারই মনে ভক্তির উদয় হয়, তারই মস্তক আপনা হইতে সেই দেবীর সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া সকলেই বড় শঙ্কিত হইল। বিবাহার্থী হওয়া দূরে থাকুক, আর কেহ সাবিত্রীর বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্তও শুনিতে সাহস করিল না। চারিদিক হইতে রাজার লোক নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিল।

দেশ বিদেশ হইতে ভাটের দল ফিরিয়া আসিয়াছে; দূতেরা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব খবর লইয়া দেশে ফিরিতেছে; সাবিত্রীর পাত্র জুটিবে কি? বিবাহের কথা পাড়িলেই পাত্রের দল কানে আঙ্গুল দেয়, তাড়া করিয়া ধরিতে আসে, আর ধরিতে পারিলে প্রায়ই উত্তম-মধ্যম না দিয়া ছাড়ে না! বলে, "আমাদের মা, তাঁ'র নামে এমন কথা বলিস্? নাক কান কাটিয়া দিব!" কত জনের যে পিঠের ছাল গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই! কে আর সাধ করিয়া নিরর্থক যন্ত্রণা সহ্য করিবে? দেখিয়া শুনিয়া অশ্বপতি প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার ললাটদেশ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এত আদরের কন্যা—কালে কালে এত বড় হইল, কিন্তু তবু তার বিবাহ হইতেছে না—বিবাহ দূরে থাকুক, একটা পাত্রও মিলিতেছে না! রূপ, গুণ,

ধনৈশ্বর্য্য, ইহাদের মোহিনী শক্তিও বিফল হইল! ইহা কি কম চিন্তার কথা? ভাবিতে ভাবিতে অশ্বপতি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সাবিত্রী দিন দিন আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল!

রূপের জন্য বিবাহ হয় না, এ এক অলৌকিক কথা বটে! রমণীর সৌন্দর্য্য কামনারই সৃষ্টি করে জানি, কিন্তু ত্যাগস্পৃহার যে সৃষ্টি করে, এ কথা ত আমরা আর কখনও শুনি নাই! একমাত্র সাবিত্রীচরিত্রেই আমরা এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। সাবিত্রী যে বাস্তবিকই রমণীকুলশিরোমণি, আর নারীবেশে এক ছদ্মবেশিনী দেবতা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাবিত্রী যে আপনার বলে শেষকালে ধর্ম্মকেও পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-রাজকেও যে পরাস্ত করিয়া স্বীয় পতির উদ্ধার সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার সূচনা আমরা যেন এই খানেই দেখিতে পাই।

সাবিত্রীর যখন কিছুতেই বিবাহ হইল না, তখন অশ্বপতি একটা বুদ্ধি স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার কন্যা অপূর্ব্বতেজঃশালিনী, তাই কেহ সাহস করিয়া তাহার পাণিগ্রহণার্থী হইতেছে না। এইবার

তাহাকে স্বয়ম্বরা করিব। সাবিত্রী যদি নিজ ইচ্ছায় স্বহস্তে কাহাকেও যাইয়া বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

অশ্বপতি এই ভাবিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বপতির এই চেষ্টাতেও প্রথমে একটু গোল বাঁধিল। সাবিত্রী তো স্বয়ম্বরা হইতে যাইতেছেন, কিন্তু সে স্বয়ম্বর-সভায় বরমাল্য গ্রহণ করে কে? অশ্বপতি কত ব্যয় করিলেন, কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তবু সেই বিরাট স্বয়ম্বর-মণ্ডপটী একবারেই খালি পড়িয়া রহিল। কত ছোট খাটো রাজকন্যাদের স্বয়ম্বরে সহস্র সহস্র রাজপুত্রের সমাগম হয়, কিন্তু সাবিত্রীর স্বয়ম্বরে কেহই আসিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া অশ্বপতি অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইবার অশ্বপতি সাবিত্রীকে তীর্থ-ভ্রমণে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। তীর্থ-ভ্রমণে মন পবিত্র হয়, কর্ম্ম-দোষ খণ্ডিত হয়, এবং বহু লোকের সহিত পরিচয়ও হইয়া থাকে। সাবিত্রী অপূর্ব্বা স্থিরবুদ্ধিশালিনী—সাবিত্রী কি এই সুযোগে আপনার ভর্ত্তৃ-অন্বেষণে সক্ষম হইবেন না? অশ্বপতি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন সাবিত্রীকে ডাকিয়া সেইকথা কহিলেন।

দেবতার মন্দিরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, কাঁসরের ধ্বনিতে চারি দিক্ ঝঙ্কার দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নহবতও বাজিতেছে, সারাদিন উপবাসের পর সাবিত্রী পূজা সমাপ্ত করিয়া শূন্য ফুলের ডালাটী হস্তে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় অশ্বপতি তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা! একবার এইদিকে এস দেখি মা।"

পিতা ডাকিয়াছেন, সাবিত্রী আসিয়া শূন্য ফুলের ডালাটী নামাইয়া রাখিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

অশ্বপতি তখন একবার সাবিত্রীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। সাবিত্রী ক্রমে পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, ষোড়শে পদার্পণে তাঁহার কান্তির সাগরে ঢেউ উঠিয়াছে—স্বাভাবিক নির্ভীক বদনমণ্ডল একটু লজ্জাবনত হইয়া পড়িয়াছে,—ললাটে, ভ্রূভঙ্গিতে ও নয়নে বালসুলভ সরলতার পরিবর্ত্তে এক প্রতিভামণ্ডিত লজ্জার ছায়া আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। অশ্বপতি বুঝিলেন, এখন আর কন্যাকে বিবাহ না দিলে কিছুতেই চলে না। কেবল যে ধর্ম্মনষ্ট হয়, তাহা নহে; জাতি যায়, কুল যায়, বংশগৌরব নষ্ট হয়, থাকে কি? অশ্বপতি সাবিত্রীকে

ইঙ্গিতে সেই কথা জানাইয়া কহিলেন,—

"মা,

প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ, তোমার সম্প্রদান-কাল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তোমার জন্য আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন না। অতএব এইবার তুমি নিজেই নিজের গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ করিয়া লও।

অশ্বপতি এই কথা কহিয়া সাবিত্রীকে তীর্থ-ভ্রমণের কথাটি ভাঙ্গিয়া বলিলেন। শুনিয়া সাবিত্রী অধোমুখী হইলেন।

অশ্বপতির কথা শুনিয়া সাবিত্রীর সুন্দর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সাবিত্রী কথা কয় না! কথা কয় না, ঘাড়ও তোলে না। সাবিত্রীর কি তখন লজ্জা হইতেছিল? হইতে পারে। বিবাহের কথা শুনিলে কোন্ আর্য্যনারী না ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা হন? কিন্তু লজ্জার চেয়ে সাবিত্রীর মনে তখন আর একটা মহত্তর ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল; তা'তে লজ্জাদেবী একটু আড়ালে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সেটা একটা পরদুঃখ-কাতরতার— পরদুঃখ-দর্শনে স্বার্থত্যাগানুরাগের পবিত্রভাব! সাবিত্রী

ভাবিতেছিলেন, "আহা, আমার এমন স্নেহময় পিতা, এমন স্নেহময়ী মাতা, তাঁহাদের যত দুঃখ কষ্ট আমারই জন্যে। আমার জন্যেই তো তাঁহাদের যত অশান্তি? আমিই তো তাঁহাদের সকল চিন্তার কারণ। প্রাণ দিয়াও কি তাঁহাদের এ কষ্ট দূর করা আমার উচিত নহে? অবশ্যই উচিত। লজ্জাবোধ হইলে কি করিব?—এ গুরুভার আমায় লইতেই হইবে।"

সাবিত্রী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আপন কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্বাধীনভাবে কোর্টসিপ্ করিতে পারিবেন, এ আনন্দে নয়—পিতা-মাতার দুঃখ দূর করিতে হইবে, এই বিবেচনায় সাবিত্রী এই গুরুভার লইতে আর ইতস্ততঃ করিলেন না। মন স্থির করিয়া বিনীত ভাবে পিতার নিকটে, আরও কি কহেন, শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অশ্বপতি আবার কহিলেন, "মা, চিন্তিত হইও না; তুমি স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞা, বুদ্ধিমতী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা; এই গুরুভার তুমি বহন করিতে পারিবে, আমার এমত বিশ্বাস আছে। তাই তোমাকে আজ এ আদেশ দিলাম। আর তোমার সহায়তার জন্য আমি সঙ্গে অনেক লোক-জনও দিব। রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ ও পরিচারিকাগণ

সকলেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তাহাদের সাহায্যে অবশ্যই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তাহাদিগকে লইয়া তীর্থে তীর্থে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিয়া তুমি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া আইস; আমি বিবেচনা করিয়া তাহারই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব!"

এই বলিয়া অশ্বপতি সাবিত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাবিত্রীও মস্তক অবনত করিয়া পিতৃচরণ স্পর্শ পূর্ব্বক পিতৃ-আজ্ঞা পালনে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিক্রান্তা হইয়া চলিয়া গেলেন।

সাবিত্রী চলিয়া গেলে, অশ্বপতির চক্ষু দুইটী হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হায়, তাঁহার এত আদরের এমন লক্ষ্মীতুল্যা কন্যা—তাহাকেও কিনা আজ পতি-অন্বেষণে বনে যাইতে হইতেছে!

তপোবনে সাবিত্রী

১

তারপর একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাবিত্রী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সহচরীগণ এবং কয়েক-জন বৃদ্ধমন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রিয়তমা কন্যা সাবিত্রীর নিষ্ক্রম

ভ্রমণের জন্য অশ্বপতি কোনও আয়োজনেরই ত্রুটী রাখিলেন না। অপূর্ব্ব সুন্দর রথ তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। মহারাজ অশ্বপতি প্রিয়তমা কন্যাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইয়া রাখিয়া আসিলেন।

সাবিত্রীর দিব্য রথ নানা নদ, নদী, উপত্যকা, কানন ও পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। নগরের বাহিরে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া সাবিত্রী বড় আনন্দিত হইলেন। প্রাচীন ভারতের তপোবন, উপবন ও কাননের শোভা অনির্ব্বচনীয়। সে শোভা সম্পদের কথা আমি অক্ষম গ্রন্থকার আজ তোমাদের নিকটে কিরূপে বর্ণনা করিব! এই শোভা সম্পদের কথা বর্ণনা করিতে করিতেই না একদিন বাল্মীকির প্রতিভা জগতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? এই শোভা-সম্পদের কথা কহিতে কহিতেই না একদিন কালিদাসের প্রতিভা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া গিয়াছিল? এই শোভা-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতেই না একদিন বৈদেশিক কবি গেটে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—যে যদি বাস্তবিক কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে এইখানে? এই শোভার বক্ষে লালিত-পালিত হইয়াই না আমাদের আর্য্যঋষিগণ এককালে এক বিশ্ববিজয়িনী শক্তিতে

জগৎকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন? এই শোভা-সম্পদের মধ্যেই না একদিন মৃগশাবক নির্ভয়ে সিংহশিশুর সহিত খেলা করিত—সর্প ও ভেক, শৃগাল ও ব্যাঘ্র, নিঃশঙ্কচিত্তে একত্রে ভ্রমণ করিত? সেই সকল অপূর্ব্ব রমণীয় স্থানের কথা এই হিংসাদ্বেষপূরিত অধমকালে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে আমি তোমাদের নিকটে বর্ণনা করিব?

সাবিত্রী রথারোহণে এই সকল মনোরম দৃশ্যের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কত নয়নরঞ্জন সামগ্রীই দেখিতে পাইলেন। কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিনী মধুর 'কুলু-কুলু' শব্দে বহিয়া যাইতেছে; কোথাও নানা জাতীয় পক্ষীরা শ্যামল বৃক্ষশাখার উপরে বসিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে; কোথাও উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের বারিরাশি 'তর তর' শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে; কোথাও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে বাতাসের আঘাতে শ্যামল ঢেউ উঠিয়াছে; কোথাও মেঘখণ্ডগুলি সন্ধ্যার সিন্দূর-রাগের সঙ্গে কোলা-কোলি করিয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে; কোথাও তপোবন-নিঃসৃত তপস্বিগণের মধুর বেদধ্বনি চারিদিকে কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব ছড়াইয়া দিতেছে; কোথাও মেষশাবক চারু নৃত্য করিতেছে; কোথাও শিখিগণ

পেকম ধরিয়াছে ; কোথাও মৃগশিশু ও গাভীগণ শান্ত-ভাবে বিচরণ করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে সাবিত্রীর হৃদয় বন্য সৌন্দর্য্যে ভরিয়া গেল। সাবিত্রী বার বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্গীদিগকে কেবলি সেই সকল দৃশ্য সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে নানা বিষয়ে নানা নূতন নূতন কথা কহিয়া প্রফুল্লিত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে সেই দিন অবসান হইয়া আসিল। তখন তাঁহারা সেই রাত্রির জন্য এক তপস্বীর আশ্রমে যাইয়া বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন। অশ্বপতি-দুহিতা পতি অন্বেষণে ভ্রমণে যাইতেছেন,—জানিতে পারিয়া আশ্রমের মুনিপত্নীগণ ও মুনিবালিকাগণ দৌড়িয়া আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং 'শিবতুল্য বর লাভ কর' এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাবিত্রীকে পাইয়া তাঁহাদের বড় আনন্দ হইল। তাঁহাদের মনে হইল, যেন কোনও স্বর্গের দেবীর আবির্ভাবে আজ তাঁহাদের তপোবনখানি হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া সেই রাত্রি অনেক ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ করিলেন। তাঁহাদের সেই মধুর

বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে সাবিত্রীর হৃদয়ও যেন কি এক আনন্দে ভরিয়া গেল। সাবিত্রীর বোধ হইল, যেন তেমন শান্তি, তেমন আনন্দ, তাঁহার আর হয় নাই। নগরের রাজভোগ অপেক্ষা ঋষিদের এই বন্য সুখ-শান্তি সাবিত্রীর নিকটে পবিত্রতর বলিয়া বোধ হইল। ঋষিকন্যাদের বিমল সহবাসে সাবিত্রীর সেই রাত্রি পরমসুখে কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে মুনিপত্নীদের নিকটে বিদায় লইয়া, মুনিঋষিদের প্রণাম করিয়া সাবিত্রী আবার রথারোহণে বহির্গত হইলেন। সাবিত্রীর রথ আবার নানা রম্য কানন, উপত্যকা ও প্রান্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। আবার নানা রমণীয় দৃশ্যে ও স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সাবিত্রীর চিত্ত ভরিয়া গেল।

এইরূপে দিবাতে রথারোহণে ভ্রমণ ও রাত্রিতে আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে সাবিত্রী একে একে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; সাবিত্রীও তীর্থের পর তীর্থ, নগরের পর নগর, আশ্রমের পর আশ্রম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দান-ধর্ম্ম, দেব-দর্শন ইত্যাদি চলিতে লাগিল। তীর্থে তীর্থে দেবদর্শন,

আশ্রমে আশ্রমে মুনি-ঋষিদের বন্দনা এবং নগরে নগরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে এবং গরীব-দুঃখীগণকে অকাতরে ধনরত্নাদি দান করিতে করিতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, অতুল আনন্দে কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর পথভ্রমণে ক্লান্তি নাই, পরিশ্রম নাই, আলস্য নাই—তিনি কেবলই চলিতে লাগিলেন। রাজাদের পরম স্নেহ, মুনি-ঋষিদিগের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ এবং বনবাসিনীদিগের সরলতাপূর্ণ কোমল ব্যবহারে সাবিত্রী পথের কষ্ট এতটুকুও অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্ত ক্রমেই যেন কি এক অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া যাইতে লাগিল; হৃদয় প্রশস্ত হইল; ধর্ম্মের ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাবে তাঁহারা মদ্রদেশের সীমাও অতিক্রম করিলেন। মদ্রদেশের বাহিরে আরও কত সুন্দর সুন্দর রাজ্য রহিয়াছে, কত সুন্দর সুন্দর তপোবন, উপবন ও আশ্রম ভারতের বক্ষ চিত্র-শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। সাবিত্রী একে একে সেই সব দেশেও ভ্রমণ করিলেন। তাঁহারা যেখানে যাইতে লাগিলেন সেখানেই সকলে তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর কথা তাঁহারা পূর্ব্বেই

শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—এইবার স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। সাবিত্রী নিজ গুণগ্রামে এবং মধুর ব্যবহারে তাঁহাদিগকে আরও মুগ্ধ করিয়া দিলেন।

এইরূপে অনেক দিন গেলে, অবশেষে একদিন সাবিত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ হইবার সূচনা হইল। সাবিত্রী পতি-অন্বেষণে আসিয়াছিলেন, এত দিন এত ভ্রমণ করিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, অবশেষে একদিন সে বাসনা সিদ্ধির উপক্রম হইল। নানা দেশ, নানা তীর্থ ও নানা আশ্রম ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একদিন সন্ধ্যার বায়ু যখন ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিতেছিল এবং দূর প্রান্তে গোধূলিকণিকার সহিত সন্ধ্যার আলোকরশ্মি আকাশের গায় মিলাইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহারা আসিয়া এক রমণীয় কাননে কোনও এক অন্ধ তপস্বীর কুটীরে রাত্রিবিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন। নগরে নগরে, রাজবাড়ীতে রাজবাড়ীতে, ধনীর ঘরে ঘরে যে রত্ন মিলে নাই,—বিধাতার কি লীলা!—অবশেষে এই দরিদ্রের কুটীরেই সেই অমূল্য রত্নের সন্ধান হইল!

২

সাবিত্রীর রথ যখন সেই তপোবনের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেই আশ্রমের একপার্শ্বে মুক্ত প্রাঙ্গণের উপরে একটী অদ্ভুত ক্রীড়া চলিতেছিল। নবদূর্ব্বাদলে বসিয়া একটী বালক এক অতি অদ্ভুত ক্রীড়ায় রত ছিলেন। বালক যে নিতান্তই বালক ছিলেন, তাহা নহে।—তাঁহার বয়স কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পড়িয়াছিল। যৌবনের ছটায় তাঁহার স্বাভাবিক সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার চোখে-মুখে এক অপূর্ব্ব তেজস্বিতার ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। কিন্তু তথাপি বালককে বালক বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

সমস্ত যৌবনের লক্ষণের মধ্যে তাঁহার একটা নিতান্ত শিশুর ভাব ছিল। বালক:[যৌবনে পদার্পণ করিলেও তাঁহার সমস্তটা শরীরে একটা আশ্চর্য্য কোমলতা ও অপূর্ব্ব সরলতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। দেখিয়াই বোধ হইতেছিল, তিনি কোন ঋষি-পুত্র হইবেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধানে বল্কল ও সমস্ত শরীরে ঋষিজনোচিত এক পবিত্র জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃ ও সেই পবিত্রতাময় ভাবটী লইয়া সেই সারল্যময় কিশোর সেই সময় একটী ক্ষুদ্র অশ্বশাবকের গলা জড়াইয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। কখনও বা তাহাকে ঘাস খাওয়াইয়া দিতেছিলেন, কখনও বা আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠে নানারূপ হাত বুলাইতেছিলেন, আবার কখনও বা তাহার সঙ্গে একটু আধটু দৌড়িতেও ছিলেন। দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন ক্ষুদ্র জানোয়ারটীও ইহাতে বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিল। কারণ সেও তাহার প্রভুকে পুলকিত করিবার জন্য বারংবার উল্লম্ফনপূর্ব্বক নানারূপ বিচিত্র বিচিত্র নৃত্য দেখাইতেছিল। ঋষি-পুত্র এই অবস্থায় হঠাৎ বনের পাশে একটী অপূর্ব্ব রথের সমাগম উপলব্ধি করিলেন।

অকস্মাৎ বনের ধারে একটী রথ আসিয়া লাগিয়াছে, রথ হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বেশ-ভূষা লইয়া অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নরনারী নামিতেছে,—বালক ক্রীড়া করিতে করিতে এই দৃশ্য দেখিয়া দৌড়িয়া তাঁহাদিগের পরিচয় লইতে গেলেন। সেই সময় সেই আশ্রমে, একটী বৃহৎ শালবৃক্ষতলে বসিয়া আরও দুইটী স্ত্রী-পুরুষ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন! তাঁহারা বালকের পিতামাতা। কিন্তু তাঁহারা একটী অন্ধ ও আর একটী নারী মাত্র। তদুপরি উভয়েই বার্দ্ধক্যপীড়িত। সুতরাং আশ্রমের তত্ত্বাবধান, পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা এবং অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনাদি—এ সকল সর্ব্বদা বালককেই করিতে হইত। তাই আজ বালক নিজেই তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। বালকের অশ্বশাবকটীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেল। যেন সেও তাহার প্রভুকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইল!

বালক আসিয়া আগন্তুকদের অপূর্ব্ব রথ ও উজ্জ্বল বেশভূষা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সাবিত্রীর অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি, তাঁহার সখীগণের অপূর্ব্ব রত্নাভরণ-ভূষিত দিব্য দেহ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রিগণের নানা বেশভূষা-

মণ্ডিত গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া বালক ভাবিলেন, ইঁহারা কোন বিশেষ অতিথিই হইবেন। তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঋষি-তনয়কে দেখিতে পাইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে একজন কহিলেন, "ঋষি-তনয়, আমরা দেশভ্রমণ করিয়া আসিতেছি, উদ্দেশ্য আরও দেশভ্রমণ করিব। আজ রাত্রিতে এই খানে বিশ্রাম করিতে চাই। বলিতে পারেন, এ কাহার আশ্রম?"

বালক কহিলেন "মহাশয়, আপনারা আজ রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার পিতা দ্যুমৎসেন এই আশ্রমের অধিপতি। এক কালে তিনি শালদেশের নরপতি ছিলেন। আজ আঠার বৎসর যাবৎ অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হইয়া এইখানেই বাস করিতেছেন। তিনি এখন তপস্বী। আসুন, আপনা-দিগকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাইব।"

বালকের এই কথা শুনিয়া সকলেই বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অকস্মাৎ সেই বিজন বনে শালদেশীয় নর-পতির অপূর্ব্বশৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন একমাত্র পুত্রকে ঋষি-তনয়ের বেশে দেখিয়া তাঁহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সাবিত্রী মনে করিলেন, ওরূপ দেবতুল্য

পুরুষ যেন তিনি আর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। রাজপুত্রের এই ঋষিবেশ ও ব্রহ্মচর্য্যানুরাগ তাঁহার চক্ষে বড় পবিত্র ও দুর্লভ বলিয়া বোধ হইল। মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন বড় সুন্দর দেখায়, নীলাকাশের গায় তারাগুলি যেমন বড় সুন্দর ফোটে, সাবিত্রী নানা দুরবস্থা ও দরিদ্রাভরণের মধ্যেও এই রাজতনয়কে তেমনই অধিকতর উজ্জল দেখিতে পাইলেন।

রাজমন্ত্রী বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"কুমার—"

কিন্তু এইটুকু কহিতেই বালক বাধা দিয়া কহিলেন, —"মহাশয়, আমাকে সত্যবান্ বা চিত্রাশ্ব* বলিয়াই জানিবেন—আমি এখন ঋষি-পুত্র মাত্র!"

সত্যবানের এই বিনীত প্রতিবাদে সাবিত্রী ও তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল। রাজপুত্রের এই নিরহঙ্কার ভাব সাবিত্রীর নিকট বড় মনোরম ও পবিত্র বোধ হইল। গর্ব্বিত,

---

* সত্যবান্ বাল্যকালে বড় অশ্বশাবকপ্রিয় ছিলেন। যেখানে সুবিধা পাইতেন, সেইখানেই মৃত্তিকার উপরে অশ্ব-চিত্র অঙ্কিত করিতেন। এই পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগেও তাঁহার এই অশ্বশাবকপ্রিয়তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহার অপর নাম হইয়াছিল—চিত্রাশ্ব।

অহঙ্কারস্ফীত রাজপুত্রদের বৃথা আড়ম্বরের সহিত সাবিত্রী সত্যবানের এই অপূর্ব্ব অনাড়ম্বরভাব তুলনা করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিলেন।

রাজমন্ত্রী তখন তাঁহাকে 'সত্যবান্' বলিয়াই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সত্যবান্, আজ আমরা অকস্মাৎ এই রমণীয় স্থানে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন ও তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবানের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমাদিগকেও রাজ-অতিথি বলিয়াই জানিবেন। আমি মদ্রাধিপতি অশ্বপতির প্রধান মন্ত্রী, আর ইনি তাঁহার একমাত্র কন্যা—সাবিত্রী। চলুন, আজ আমরা আপনার পরমধর্ম্মনিষ্ঠ পিতামাতার চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হই।"

অশ্বপতিদুহিতা সাবিত্রীকে সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া এবার সত্যবানও কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সাবিত্রীর পরিচয় পাইয়া সত্যবানও এবার তাঁহার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী ততক্ষণ পুলকিত নেত্রে তাঁহার দিকেই চাহিয়াছিলেন। এইবার তাঁহাকেও তাঁহার দিকে চাহিতে দেখিয়া আপন দৃষ্টি বিনত করিলেন।

তখন সত্যবানও অন্যদিকে চাহিলেন।

৩

অন্ধমুনি ও অন্ধমুনিপত্নী শুনিলেন, অশ্বপতি-দুহিতা সাবিত্রী তাঁহাদিগের অতিথি হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহারা পরম পুলকিত হইলেন। সাবিত্রী আসিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নানারূপ কুশলপ্রশ্ন ও কথোপকথনের পর তাঁহারা সত্যবানকে ডাকিয়া তাঁহাদের যথাবিধি অভ্যর্থনার কথা বিশেষ করিয়া কহিয়া দিলেন। সত্যবানও প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেই কাননের অপরাপর পার্শ্বে দ্যুমৎসেন ভিন্ন আরও কতক জন তেজস্বী মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সাবিত্রীর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া তাঁহারাও একে একে দেখিতে আসিলেন। ঋষিবালিকা ও ঋষিপত্নীগণও ক্রমে ক্রমে আসিয়া সাবিত্রীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগের মধ্যে চন্দনমণ্ডিত পুষ্পবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন।

ঋষিবালিকাদের শান্তোদার ভাবে সাবিত্রী বড় বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে চিরপরিচিতের মত হস্তে ধরিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই হাসিতে হাসিতে এদিক ওদিক্ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। আশ্রমের এদিক সেদিক ঘুরাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে কত দৃশ্যই দেখাইতে লাগিলেন।

ঋষিপত্নীরাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে সাবিত্রীর বেশ আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহারাও তাঁহাকে তপোবনের নানা স্থানে লইয়া যাইয়া এটা ওটা অনেক দেখাইলেন।

মুনিদের তপোবন কি সুন্দর! সাবিত্রী ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক তপোবন দেখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ সুন্দর

যেন আর দেখেন নাই। সাবিত্রী দেখিলেন, সেই তপোবনে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, বিষাদ নাই, অমঙ্গলের ছায়াটুকু মাত্র নাই—কেবল আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ,—আর চারিদিকে এক বিরাট শান্তিময় ভাব! কোথাও ময়ূর-ময়ূরী নাচিতেছে, কোথাও মাধবীলতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিতেছে, কোথাও শুক-শারী বৃক্ষশাখায় বসিয়া গান করিতেছে, কোথাও মৃগশিশুগুলি নির্ভয়ে আসিয়া মুনিবালকদিগের অঙ্গস্পর্শ করিতেছে, কোথাও অপূর্ব্ব বন্যকুসুম রাশি রাশি ফুটিয়া ফুটিয়া, শ্যামল পত্রগুচ্ছের আবরণ হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে,—বুঝি মুনিকন্যাদের মত তাহারাও আপনাপন রূপ ও বেশভূষা দেখাইতে সঙ্কুচিত! কোথাও ঋষিবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া নানা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কোথাও নানা কঠোর তপস্বী যজ্ঞের ধূমে চারিদিক পবিত্র করিয়া দিয়া উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি করিতেছেন, কোথাও ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ-সলিলা নির্ঝরিণী পর্ব্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া মন্দ্র-মধুর ধ্বনিতে নদী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কোথাও অপূর্ব্ব সরোবর,—তাহাতে শান্তশিষ্ট রাজহংসগুলি গ্রীবা উন্নত করিয়া মৃণালে মৃণালে কেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!—তাহাদের চরণাঘাতে

সরোবরস্থিত শতদলগুলি কোথাও কোথাও ভ্রমরের আলিঙ্গন হইতে বিচ্যুত হইতেছে, বিচ্যুত হইয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা কামিনীর মত হাসিতে হাসিতে সলিলতলে লুকাইয়া যাইতেছে !

সাবিত্রী এই সকল দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যাঁহারা এমন স্থানে এমন ভাবে, এমন পবিত্র জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের মত সুখী যেন জগতে আর নাই। সাবিত্রী এই সকল দেখিয়া কত কথাই না ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার রক্তিম রাগের সহিত সাবিত্রী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া সাবিত্রী আরও এক পবিত্র দৃশ্য দেখিলেন। সন্ধ্যার পর মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া মুনি-বালকেরা এক সঙ্গে সান্ধ্য স্তোত্র পাঠ করিতেছে ! সে দৃশ্যের তুলনা হয় না ! সাবিত্রী তাহা দেখিয়া জগৎ বিস্মৃত হইলেন। সে স্তোত্র কি মধুর ! সে ধ্বনি কি প্রাণস্পর্শী ! মুনিবালকদের সে অপূর্ব্ব তেজপূর্ণ অবয়ব, উচ্চ সুমধুর তান সাবিত্রীকে যেন কি এক মায়াময় রাজ্যে লইয়া গেল ! সত্যবানের মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, এ যেন স্বপ্ন ! সাবিত্রী সেরূপ

স্বর, সেরূপ স্বর্গীয় চিত্র যেন আর কখনও দেখেন নাই। তিনি এক দৃষ্টে তাঁহার মুদিত পবিত্র আননের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি এক পবিত্রতাময় ভাব আসিয়া যেন তাঁহার হৃদয় মোহিত করিয়া দিল।

সান্ধ্য স্তোত্র সমাপিত হইলে, সকলে ফলমূল ভক্ষণ করিলেন। সাবিত্রীও তাহার ভাগ পাইলেন। আহারান্তে সাবিত্রী পুনরায় বৃদ্ধদম্পতীর নিকট যাইয়া নানা ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিতে বসিলেন। নানা সুন্দর সুন্দর উপদেশ, সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই পবিত্র কাহিনীগুলি শুনিতে শুনিতে গভীর রাত্রে সাবিত্রী সেই ক্ষুদ্র কুটীরের তৃণাচ্ছাদিত মেজেতেই পরমানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে রাত্রি যেন তাঁহার একটী সুখস্বপ্নের মত অতিবাহিত হইয়া গেল! সাবিত্রীর সঙ্গের লোক-জনেরাও বৃক্ষতলে শয্যারচনা করিয়া সে রাত্রি পরম সুখে কাটাইয়া দিল!

প্রত্যূষে উঠিয়া সাবিত্রী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আহা! মুনিবালিকাদের কি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ! তাঁহারা তাঁহার দিকে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল। মুনি ও মুনিপত্নীগণ আসিয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ

করিয়া বিদায় দিলেন। সত্যবান্ তাঁহাদিগের রথখানি প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য সারথির উদ্দেশে গমন করিলেন।

যাইবার সময় সত্যবানের পিতামাতা সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা, এখন কোন্ দেশে যাইবে ?"

সাবিত্রী সেই কথা শুনিয়া হঠাৎ আপনার প্রফুল্ল বদনমণ্ডলখানি সঙ্কুচিত করিলেন!

সাবিত্রী লজ্জাবনত বদনে, আরক্তিম মুখে উত্তর করিলেন, "মা, আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই, এইবার দেশে ফিরিব।"

বৃদ্ধ-দম্পতী এই কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যানুভব করিলেন।

রথ সন্নিকটবর্ত্তী হইলে বৃদ্ধমন্ত্রীও সাবিত্রীকে পুনঃ সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ-দম্পতীর সঙ্গে সাবিত্রীর কি কথা হইয়াছিল, তিনি তাহা জানেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোন্ দিকে রথ যাইবে মা ?"

সত্যবান্ সেই সময় রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বল্কল-

পরিহিত উন্নত বপুর দিকে চাহিয়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে সাবিত্রী আবার সেই উত্তর করিলেন! সাবিত্রী আবার কহিলেন, "মন্ত্রিবর, আর কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই, এখন পুনঃ দেশাভিমুখে ফিরিব।"

বৃদ্ধ-দম্পতীর মত মন্ত্রিবরও এই উত্তরে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু তিনি সারথিকে অবিলম্বে সেই আজ্ঞা দিলেন। একবার সাবিত্রীর মুখের দিকে ও একবার সত্যবানের অপূর্ব্ব উন্নত দেহ যষ্টির দিকে চাহিতেই তাঁহার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেগবান্ অপূর্ব্ব রথ তাঁহাদিগকে লইয়া আবার দ্রুত মদ্রদেশে ফিরিয়া চলিল।

সাবিত্রীর বিবাহ

১

স্বর্গের ঋষি নারদ মুনির একটু কার্য্যভঙ্গানুরাগের পৌরুষ আছে। এখন ব্রহ্মা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "নারদ, সাবিত্রী তো পতি নির্ব্বাচন করিয়া দেশে ফিরি-তেছে, এখন তোমাকে একটু

পরিশ্রম করিতে হইবে। সত্যবান্ স্বল্পায়ু, এ কথাটা মর্ত্ত্যে যাইয়া যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জানাইয়া আসিতে হইবে ;—আমার ইহাতে বিশেষ কাজ আছে। তুমি এখনি যাইয়া যে কোনরূপে হউক, তাহাকে জানাইয়া আইস যে, আজ হইতে ঠিক এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু—ইহা বিধাতার বিধান !"

ঠাকুরটী 'একেই নাচুড়ে বুড়ী, তাহাতে আবার এই ঢোলের বাড়ি' পাইয়া বেশ আনন্দিত হইলেন। তিনি তখনই গায়ে একটা নামাবলি ও হাতে একটা মস্ত বীণা লইয়া সাঁ সাঁ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দেখিতে না দেখিতে মুনিবর মর্ত্ত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাবিত্রী নগরে ফিরিয়াছেন, রাজবাড়ীর প্রায় নিকটে আসিয়াছেন, এমন সময় ঋষিঠাকুর অশ্বপতির সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সম্মুখে নারদমুনিকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাগ্রহে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়া নানারূপ সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিজের আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। ঠাকুরটী নানারূপ কুশলপ্রশ্নাদির পর একথা সেকথা করিয়া কত কথাই আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সভায় খবর আসিল, সাবিত্রী ফিরিয়া আসিয়া-

ছেন ; সঙ্গে সঙ্গে দাস, দাসী, সারথি, মন্ত্রী প্রভৃতিও ফিরিয়া আসিয়াছে ; সকলেই সভাদ্বারে রাজদর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া।—শুনিয়া অশ্বপতি বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। অশ্বপতি ভাবিতে লাগিলেন, হায়, সাবিত্রী না জানি কি করিয়াই আসিয়াছেন! কন্যার ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতেছে, সপ্তদশে পড়িতে আর কয়দিন মাত্র বাকী। সাবিত্রী যদি বিফল-মনোরথ হইয়া আসিয়া থাকেন, তবে না জানি কি অনর্থই ঘটিবে। অশ্বপতি সে অনর্থের কথা চিন্তা করিতেও ভীত হইলেন। তিনি তখনই কন্যাকে সভামধ্যে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিলেন।

সাবিত্রী সভাপ্রবিষ্টা হইলে, তাঁহার উজ্জলস্নিগ্ধপ্রভায় গৃহখানি যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। বনভ্রমণে ও মুনি-ঋষিদের সহবাসে সাবিত্রীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর একটা পবিত্রতার জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িয়াছিল ; সেই জ্যোতিতে তাঁহার দেবীভাব আরও যেন উজ্জল দেখাইতে লাগিল, সকলেই তাঁহার দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ঋষি-ঠাকুরও অশ্বপতির ঘরে এ দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া কতক্ষণ বিভোর হইয়া রহিলেন। তাঁহার বীণাটী হাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-

তন্ত্রীগুলি সেই সময় কেমন এক কোমল ও ভক্তির সুরে যেন বাজিয়া উঠিল।

সাবিত্রী আসিয়া প্রথমে ঋষি-ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পিতা ও অন্যান্য গুরু-জনকে প্রণাম করিয়া, একটু সরিয়া যাইয়া, অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নারদঋষি তাঁহার দিকে চাহিয়া মনে মনে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ত্ত্যে আসা সার্থক মনে হইল।

ঠাকুরটী কোঁদুলে হইলেও অন্তরে বড় ভাল ছিলেন। কাহারও অহিতাকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করিতেন না। তবে যে, সকল কার্য্যেই একটা গোলযোগ বাঁধাইয়া তামাসা দেখিতে চাহিতেন, তাহার অন্য অর্থ আছে। তিনি ভাবিতেন, নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া সকলেই তো সাধু হইতে পারে; যাহার ধনের অভাব নাই, সে তো সকলকেই ধন বিতরণ করিতে পারে;—তাহাতে আর পৌরুষ কি? যে যত বিপদে পড়িয়া নিজের সাধুতা বজায় রাখিতে পারে, দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াও ধর্ম্মকে না ভুলে, প্রাণান্তেও অসৎপথে না যায়, নিজের দিকে না চাহিয়াও ধর্ম্মের দিকে চায়, সেই না তত মানুষ? তিনি এই উদ্দেশ্যেই সকলকে নানা গোলযোগে ফেলিয়া সর্ব্বদা

তাহাদের মনুষ্যত্ব পরীক্ষা করিতে চাহিতেন। স্বর্ণকার যেমন আগুনে পোড়াইয়া সোণা পরীক্ষা করেন, তিনিও তেমনই মানুষকে সঙ্কটে ফেলিয়া তাহাদের ভাল-মন্দ দেখিতে চাহিতেন। তাহাতে জগতের ও মানুষের উভয়েরই উপকার হইত। জগৎ দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিত, মানুষও ক্রমে উন্নতির পথে যাইত। যিনি তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তিনি তো জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেনই, যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না, তিনিও অন্ততঃ নিজে নিজের দৌর্ব্বল্যটুকু বুঝিয়া সেইটুকু শোধরাইবার জন্য যত্নবান্ হইতেন। ফলে, তাহারও ভাল হইত। সুতরাং ঋষিঠাকুর প্রকাশ্যে কোঁদলপ্রিয় হইলেও, পরোক্ষে আমাদিগের বিশেষ হিতকারী বন্ধুই ছিলেন।

ঠাকুরটী এখন সাবিত্রীকে দেখিয়া মনে করিলেন, এ বালিকা সামান্যা নহে, ইহা দ্বারা জগতের বিশেষ উপকার হইবে; ইহার আদর্শ জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা চাই। কহিলেন, "মহারাজ, তোমার এ কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণা অপূর্ব্ব-গুণবতী, এত বড় কন্যাকে তুমি এখনও অবিবাহিতা রাখিয়াছ—ইহার কারণ কি? ইনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন?"

ঋষিঠাকুর সকলই জানেন, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও ক্তকটা ন্যাকার মত এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন! না হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না!

অশ্বপতি কহিলেন, "প্রভু, সে অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? সাবিত্রীর বিবাহ হইবে কি? তাহার এই রূপ-গুণই তো তাহার কাল হইয়াছে! মায়ের এই রূপ-গুণ দেখিয়াই তো কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চায় না। তাই সাবিত্রী, আমার অনুমতিক্রমে, নিজেই নিজের স্বামী-অন্বেষণে গিয়াছিলেন। এখন কি করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহার মুখেই অবগত হউন।"

এই বলিয়া অশ্বপতি সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, কি করিয়া আসিলে, ঋষিঠাকুরের নিকট ভাল করিয়া বল তো। আমরা সকলেই তোমার কথা শুনিবার জন্ম উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। লজ্জা করিয়া যেন কোন কথা গোপন করিও না।"

সাবিত্রী পিতৃবাক্য শুনিয়া নিজকাহিনী ব্যক্ত করিলেন। অবনত মস্তকে, লজ্জাসঙ্কুচিত বদনে ধীরে ধীরে সেই কথা ব্যক্ত করিলেন। লজ্জার সহিত বিনয় ও আজ্ঞানুবর্তিতা মিশ্রিত হইলে বড় সুন্দর দেখায়।
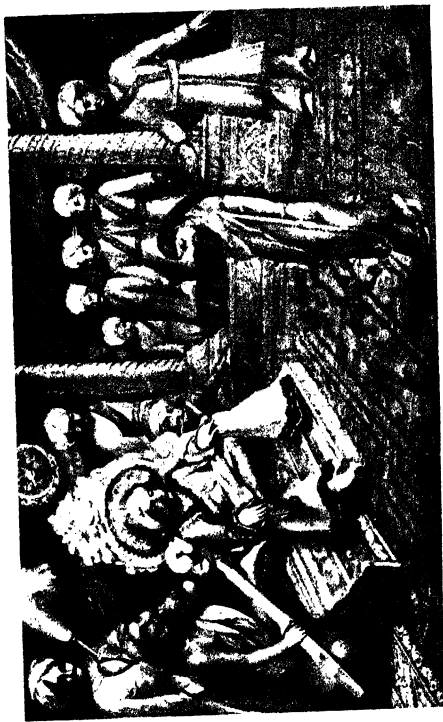
অশ্বপতির সভায় নারদ ও সাবিত্রী।

শুধু লজ্জা ভাল নহে, শুধু বিনয়ও ভাল নয়, কিন্তু দুইয়ের মিশ্রণ বড় চমৎকার। আর এই দুইএর মিশ্রণই কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের বালক-বালিকারা অনেক সময়ে এ কথাটা বুঝেন না। কেহ হয়ত লজ্জা করিলেই সব হইল মনে করেন। কেহ হয়ত বিনয় ও আজ্ঞানু-বর্ত্তিতাকেই সর্ব্বস্ব ভাবেন। গুরু ব্যক্তি যদি তোমাকে একটা কাজ করিতে আদেশ করেন, তবে লজ্জা করিয়া তাহা উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আবার আজ্ঞা পাইয়া আজ্ঞাপালন করা মাত্রও যথেষ্ট নয়। লজ্জা রমণীর ভূষণ, লজ্জা রাখিতেই হইবে। কিন্তু সেই লজ্জায় যাহাতে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী না জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা চাই। তাই সাবিত্রী এত কোমলা, এত লজ্জাশীলা হইয়াও স্বামী-অন্বেষণে বনে গেলেন। তাই সাবিত্রী পিতৃ আজ্ঞায় রাজসভায় দাঁড়াইয়াও দেখ, আজ আত্মপ্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত। কেবল তাহাই নহে, কর্ত্তব্যের খাতিরে সাবিত্রী লজ্জা এবং বিনয়টীকেও কেমন একটু অন্ধকারে ফেলিতেছেন, লক্ষ্য কর। কিন্তু সে কথা একটু পরে—আগে সাবিত্রী এই কথার উত্তরে কি কহিলেন, সেই কথাটা ভাল করিয়া বলিয়া লই।

সাবিত্রী কহিলেন, "পিতা, শালদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। আজ তিনি দৈব-দুর্বিপাকবশতঃ বনবাসী। কালক্রমে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইলে, শত্রুরা তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লয়। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ একান্ত শিশু। সুতরাং রাজ্য রক্ষা করে কে? সেই অবধি দ্যুমৎসেন, পত্নী ও শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে তপস্বী। আজ আঠার বৎসর যাবৎ তাঁহারা মহর্ষিদের তপোবনে পর্ণকুটীরমাত্রে বাস করিতেছেন! পিতা, আমি সেই সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া অশ্বপতি কিছু আশ্বস্ত হইলেন। যেমন কন্যা, তেমনই পিতা। কন্যা দরিদ্রকে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া অশ্বপতি দুঃখিত হইলেন না। সাবিত্রীর যে পাত্র জুটিয়াছে, সাবিত্রী যে রাজপুত্রকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারিয়াছেন, অশ্বপতি তাহা জানিতে পারিয়াই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু দেবর্ষি-ঠাকুর ইহাতে বড় আশঙ্কার কথা কহিলেন!

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া নারদ কহিলেন, "সাবিত্রি, মা তুমি সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ? করিয়াছ কি? আহা, না জানিয়া শুনিয়া তুমি কি মহৎ ভুলই করিয়াছ, মা—কি ভুলই করিয়াছ মা!"

মহর্ষি কেবল আপশোষ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রুতে হস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ বড় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দু'টী নাচিতে লাগিল! দেবর্ষি সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সাবিত্রী স্থির, ধীর, নিষ্কম্প! কোন উত্তরই করিলেন না, বা এতটুকুও বিচলিত হইলেন না।

কিন্তু সাবিত্রী বিচলিতা হউন, বা নাই হউন, সভার লোক দেবর্ষির কথায় বড় উৎকণ্ঠিত হইল। হায়, হায়, সাবিত্রী না জানি কি সর্ব্বনাশই করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের এত আদরের কন্যা, এত সাধের রাজকুমারী, তাও আবার এত চেষ্টা-উদ্যোগের পরে স্বয়ম্বরা হইতেছেন, ইহাতেও ঈশ্বর না জানি কি বাদই সাধিলেন। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে অশ্বপতি কহিলেন,—"ঠাকুর, এমত কথা কহিলেন যে? সাবিত্রী কি কোনও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে?"

দেবর্ষি বলিলেন, "তাহা নহে। সত্যবান্ সর্ব্বাংশেই সাবিত্রীর উপযুক্ত। রূপে, গুণে ও কুলশীলে তেমন পাত্র আর কোথায়? কিন্তু—"

অশ্বপতি কহিলেন, "কিন্তু কি প্রভু? শীঘ্র বলুন,

আমরা বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। সত্যবান্ কি জিতেন্দ্রিয় নহে ?"

নারদ কহিলেন, "তেমন জিতেন্দ্রিয় বড় দেখা যায় না। রাজার ছেলে ব্রহ্মচারী হইয়াছে—সোণায় সোহাগা মিশিয়াছে! তাঁহার উপর আবার জিতেন্দ্রিয় কে ?"

অশ্বপতি কহিলেন, "তবে কি সত্যবান্ বনবাসী—তাই এ কথা কহিতেছেন ? সত্যবান্ দরিদ্র হউন, যাই হউন, আমার তো ধনরত্ন আছে—আমি তো পুত্রহীন, তবে তাহার চিন্তা কি ?"

নারদ কহিলেন, "রাজপুত্র—বনবাসী! ক্ষত্রিয়ের রক্ত বনবাসীদের সহবাসে আরও পবিত্রতরই হইয়াছে। রাজপুত্র শিক্ষা, সংযম এবং নীতিশাস্ত্রে বিশারদ্ হইয়া আরও উৎকৃষ্টতরই হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা আর নিন্দার কথা কি ? কিন্তু সে কথাও নহে।"

অশ্বপতি বিচলিত হইয়া কহিলেন, "তবে কি ? তবে আর সত্যবানকে বরণ করিয়া সাবিত্রী কি প্রকারে ভ্রম করিলেন, শীঘ্র বুঝাইয়া বলুন—আমাদের বড় আশঙ্কা হইয়াছে।"

নারদ কহিলেন, "রাজন্, সত্যবানের সকল গুণের

মধ্যে একটা দোষ বড় দোষ! সেই দোষেই সব মাটী করিয়াছে। সত্যবান্ স্বল্পায়ু!"

অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইলে, সভাস্থ লোক অধিকতর চমকিত হইতেন না। তাঁহাদের প্রফুল্ল বদন-গুলি এক মুহূর্ত্তে উদ্বেগ-মলিন ভাব ধারণ করিল।

অশ্বপতি চমকিত হইলেন। কহিলেন, "বলেন কি?"

দেবর্ষি কহিলেন, "আজ হইতে ঠিক এক বৎসর পরে, এমনি দিনে, এমনি তিথিতে, সত্যবানের মৃত্যু হইবে। ইহা বিধিলিপি। বিধিলিপি কে অগ্রাহ্য করিতে পারে?"

অশ্বপতি বড় দুঃখিত হইলেন। হায়, হায়, এমন পাত্রেও তিনি সাবিত্রীকে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। সাবিত্রীর আর বর জুটিবে কোথা হইতে? কহিলেন,—

"ঠাকুর, তাইতো। তবে তো দেখিতেছি সবই নিষ্ফল হইল। এরূপ জানিয়া শুনিয়া আর কিরূপে কন্যাটাকে জলে ফেলিব? কি করিয়া আর তাহাকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিব?"

নারদ ঋষি নিজে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। কেবল রাজার কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন, "তাইতো, কি করিয়াই বা করিবেন?"

অশ্বপতি কতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "মা, শুনিলে তো? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। এমন পাত্রেও তোমায় আমি সমর্পণ করিতে পারিলাম না। এখন মা তুমি অন্য কাহাকেও মনোনীত করিতে চেষ্টা কর। জানিয়া শুনিয়া এমন স্বল্লায়ু ব্যক্তির হস্তে কি করিয়া তোমায় সমর্পণ করিব?

সাবিত্রী কি উত্তর করেন, জানিবার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। নারদ ঋষি সব চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠিত হইলেন। এইবার সাবিত্রীর পরীক্ষা! সাবিত্রী এখন যাহা বলিবেন, তাহা সহস্র বৎসর লক্ষ লক্ষ বৎসর, যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের আদর্শ কথা হইয়া রহিবে! বেদমাতা সাবিত্রী! তাঁহারই বরে এই কন্যা! সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ, সতী-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপনার্থ, সাবিত্রীদেবী নিজ অংশে সাবিত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সাবিত্রীর মুখ হইতে দেবী কি অপূর্ব্ব সতীধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল! একদিন হিমালয় শিখরে যে অপূর্ব্ব মনোরম পদ্মটী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাহার কোমল দলগুলি এক দিন গর্ব্বিত দেবতার নিষ্ঠুর পীড়নে দক্ষগৃহে ভস্মসাৎ

হইয়া গিয়াছিল, তাহারই সৌরভ দিগন্তবিস্তৃত করিবার জন্য, তাহারই বীজগুলি রমণীর হৃদয়ে হৃদয়ে বপন করিবার জন্য, মায়ের মহিমা সাবিত্রীরূপে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সেই মায়ের কথা শুনিবার জন্য ভক্ত ঋষি সতৃষ্ণ নয়নে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবর্ষির বাসনা পূর্ণ হইল। সাবিত্রী এক অতি সুমধুর উত্তর করিলেন। সে উত্তরে সাবিত্রীর কোমলতা ও বিনীত ভাব একটু প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সাবিত্রীর মত বালিকার এই ত্যাগস্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে আরও উজ্জ্বল করিয়াই দিল। সাবিত্রী প্রাণান্তে যে পিতাকে অমান্য করিতেন না, এই কর্ত্তব্যজ্ঞানে, এই সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ, তিনি তাঁহাকেও একটু অবাধ্যতা দেখাইতে বাধ্য হইলেন। এক দিকে পিতৃস্নেহের ব্যগ্র উপদেশ, অপর দিকে একটা ধর্ম্মের বিনাশ—সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা-হরণ। সাবিত্রী বুঝিলেন, পিতা তাঁহাকে পিতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই এই উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই সতীধর্ম্মের মর্য্যাদার প্রতি এত অন্ধ হইয়াছেন। এ আদেশের প্রতিবাদ করিলে পাপ নাই; বরং সহস্র

সহস্র রমণীর কল্যাণার্থে তাঁহাকে এ প্রতিবাদ করিতেই হইবে। সাবিত্রী তাহাই করিলেন।

সাবিত্রী পিতার কথার উত্তরে যে অমূল্য কথাগুলি কহিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়া গেলেন। সাবিত্রীর সেই উত্তরে দেবর্ষির হৃদয় নাচিয়া উঠিল, অশ্বপতির ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া গেল,—জ্ঞান-চক্ষু উন্মুক্ত হইল; সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর সেই কথাগুলি এই যুগ-যুগান্তর পরে আজিও আমাদের কর্ণে তেমনই বীণাধ্বনি করিতেছে। আজিও সেই কথাগুলি আমাদের দেশে সতীধর্ম্মের ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। সেই কথাগুলি তোমাদের প্রত্যেকেরই ভালরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত। যখন তোমাদের কাহারও মনে কখনও কোন কারণে কোনও রূপ দুর্ব্বলতা আসিতে চেষ্টা করিবে, তখন তোমরা এক একবার সেই কথাগুলি স্মরণ করিও, এক একবার দৃঢ়তার সহিত সেই শ্লোকগুলি আওড়াইও,—আবার নব জীবন লাভ করিবে। আমাদের দেশের পতিহীনা রমণীগণ এই অমূল্য শ্লোকগুলি মনে করিলে মন্ত্রৌষধির ফল পাইবেন, তাঁহাদের দুঃখময় বৈধব্যজীবন অপূর্ব্ব

বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের শূন্য সংসারের শূন্য হৃদয় আবার আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বৈধব্যকে স্কন্ধে লইয়াও সাধ্বী সাবিত্রী সত্যবানকে বরণ করিতে কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—এ চিত্র দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের এ দুঃখময় জীবনটাকে একটা নেহাতই ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মনে করিবেন। ভবিষ্যতের গর্ভে পুনঃ চিরবাঞ্ছিতের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা এই ক্ষণিক জীবনকে সকল দুঃখ, কষ্ট ও নির্য্যাতনের মধ্যেও অম্লান বদনে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। আমি সেই জন্যই আজ তোমাদের নিকটে সাবিত্রীর স্বমুখের সেই কথাগুলি ঠিক ঠিক পুনরুক্তি করিব, তোমরা মুখস্থ করিয়া রাখিও।

সাবিত্রী পিতার কথায় উত্তরে কহিলেন,—

"পিতঃ—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

লোকে সম্পত্তি বিভাগের গুটিকা একবারই মাটিতে নিক্ষেপ করে, কন্যাকে দান লোকে একবারই করে, 'দিলাম' এ কথাটাও লোকে একবারই কয়। এই তিনটী কার্য্য মাত্র একবারই সংঘটিত হয়। সুতরাং সত্যবানকে যখন একবার আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন তিনি দীর্ঘায়ু হউন, বা অল্পায়ু হউন, সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও প্রাণান্তে বরণ করিতে পারিব না। তিনি ভিন্ন আর কেহ প্রাণান্তে আমার স্বামী হইবেন না। দেখুন, লোকে কোন কার্য্য করিতে প্রথমে তাহা মনেই স্থির করে, পরে ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং সর্ব্বশেষে কার্য্যে ঘটায়। সুতরাং এই বিষয়ে মনই আমার প্রমাণ।"

অতি সত্য কথা, অতি অপূর্ব্ব কথা! আমরাও বলি তাই। লোকের চরিত্রের ভালমন্দ বিচার মন দ্বারাই করিতে হয়, শুধু কার্য্য দ্বারা করিলে চলে না। মনে পাপ থাকিলে, কার্য্যে অনুষ্ঠিত না হইলেও সে পাপ —পাপ। আবার একটা ভাল কাজ গতিকক্রমে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার কোনও মাহাত্ম্য নাই। সুতরাং সাবিত্রী সত্যবানকে যখন মনে মনে একবার আত্ম-

সমর্পণ করিয়াছেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যবানকে তিনি মনটী দিয়াই ফেলিয়াছেন,—এ কথা যুক্তিযুক্ত। অন্ততঃ সতীধর্ম্মের নিয়মে এরূপ হিসাব অপরিত্যাজ্য। সাবিত্রী এইরূপ হিসাব করিয়া প্রকৃত সতীর আদর্শই জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

সাবিত্রীর উত্তর শুনিয়া অশ্বপতি কহিলেন, "প্রভু, কি করিব? সাবিত্রী যুক্তিযুক্ত কথাই কহিতেছেন, কি করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব?"

নারদ আনন্দে অধীর। মাঝে মাঝে বীণায় ঘা দিতে চাহিতেছেন। কহিলেন, "প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। তোমার এ কন্যা অপূর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না, একান্ত স্থির-বুদ্ধি। তাহার শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে আমিও চমৎকৃত হইয়াছি। তাহাকে সত্যবানেই সমর্পণ কর। এরূপ পবিত্রা, বুদ্ধিমতী, সাধ্বী বালিকার কখনও অমঙ্গল হইবে না—হইতে পারে না।"

এই বলিয়া দেবর্ষি উঠিয়া সাবিত্রীকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বীণাধ্বনি করিতে করিতে স্বর্গের পথে চলিয়া গেলেন।

অশ্বপতিও সাবিত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মা, তোমার মুখে আজ এ অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা শুনিয়া

বড়ই সুখী হইলাম। তাই হোক। তোমার কথাই রক্ষা হউক। আমি তোমাকে এই সত্যবানের হাতেই সমর্পণ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি মা, চিরকাল যেন এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিচালিতা হইয়াই নানারূপ বিপদাপদকে তুচ্ছপূর্ব্বক জগতে চিরশান্তি লাভ কর।"

অশ্বপতির কথা শ্রবণে সাবিত্রীর মুখে মূহূর্ত্তে এক অপূর্ব্ব আলোকবিভা ফুটিয়া উঠিল।

২
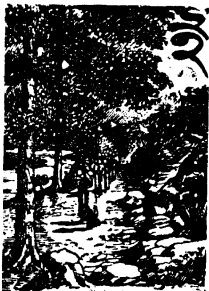
ইহার পর অশ্বপতি সাবিত্রীর বিবাহের দিন স্থির করিলেন। অশ্বপতি এই সময়ে একটা বড় মহানুভবতার কার্য্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন দ্যুমৎসেন আগে রাজা ছিলেন, এখন দরিদ্র হইয়াছেন। এই সময় তিনি রাজধানীতে আসিয়া সত্যবানকে বিবাহ করাইতে অসমর্থ। রাজার সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিতে না পারিলে, কোন্ রাজার না কষ্ট হয়? দ্যুমৎসেনেরও অবশ্য এইরূপ কষ্ট হইবে। তাঁহার এখন সে অবস্থা নাই, সে সম্পদ্‌ও নাই। তিনি এখন রাজার সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিতে অক্ষম। সাবিত্রীর বিবাহে

অশ্বপতি হয়ত কতই আমোদ-প্রমোদ করিবেন, আর তাঁহার গরীব বেহাইটি হয়ত সামান্য কিছুও না করিতে পারিয়া মনে মনে কতই ব্যথিত হইবেন। তাঁহাকে কি অশ্বপতির এ কষ্ট দেওয়া উচিত? অশ্বপতি ভাবিলেন, থাক্, আমি কাননে যাইয়াই সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সঁপিয়া দিয়া আসিব। লোকালয়ে আমোদ-প্রমোদ করিয়া আমার প্রয়োজন নাই। আমার বেহাই এখন গরীব, তিনি এত জাঁক-জমক করিয়া কেমনে আসিবেন? আর জাঁক-জমক করিয়া না আসিলেই বা তাঁহার মনে বুঝিবে কেন? আমি তাঁহার কুটীরে যাইয়াই আমোদ-প্রমোদ করিয়া সাবিত্রীর বিবাহ দিব।

এই ভাবিয়া অশ্বপতি কাননে যাত্রার দিন স্থির করিলেন। বেশী লোকজন সঙ্গে নিলে পাছে রাজর্ষির স্থানদানের অসুবিধা ঘটে, এ জন্য অতি সামান্য ভাবেই যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল আত্মীয়-পরিজন, কয়েকজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ ও উপযুক্ত দাসদাসী মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—অশ্বপতির এ ব্যবস্থায়ও কিছু ব্যাঘাত ঘটিল।

যাত্রার দিন সমাগত হইলে, দলে দলে লোক অশ্বপতির সঙ্গে চলিল। দলে দলে বাদ্যকর, দলে দলে নর্ত্তক-নর্ত্তকী, দলে দলে প্রজা তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল। যিনি নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন, তিনি তো গেলেনই। যিনি নিমন্ত্রিত হইলেন না, তিনিও মহানন্দে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সাবিত্রীর বিবাহ—তাঁহাদের একমাত্র রাজকুমারীর বিবাহ—কতদিন ধরিয়া তাঁহারা আশাপথ চাহিয়া আছেন! তাঁহারা কি এ বিবাহে না যাইয়া থাকিতে পারেন? ধনী, দরিদ্র, উভয়বিধ লোকই অসংখ্য হাতী-ঘোড়া-পতাকা প্রভৃতি লইয়া দলে দলে ছুটিল। অশ্বপতি তো তাহাদিগের কাহাকেও কিছু বলেন নাই, তথাপি তাহারা আপনাদের মেয়ের বিবাহের মতই ঘরের পয়সা খরচ করিয়া আমোদ করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সাবিত্রী কি তাহাদের পরের মেয়ে? তাঁহার বিবাহে আবার নিমন্ত্রণ কি? এ বিবাহে তাহারা না যাইলে চলিবে কেন? ধনী অসংখ্য ধনরত্ন লইয়া দান করিতে করিতে চলিল, দরিদ্র কেবল শুধু হাতেই উৎসব করিতে করিতে গেল। ধনীর অভিপ্রায়, সাবিত্রীর বিবাহে কিছু

খরচ পত্র করিবে, এ সময় না করিলে করিবে কখন? দরিদ্রের বাসনা, এ সময় কিছু নাচিয়া গাহিয়া বক্‌শিস্ আদায় করিবে, এ সময় না লইলে লইবে কখন? তাহারা নানারূপ আনন্দ-ধ্বনি ও জয় জয় চীৎকারে আকাশ-পাতাল প্রতিধ্বনিত করিয়া যাইতে লাগিল। অশ্বপতি তাহাদের রকম-সকম দেখিয়া আশ্রমের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন!

আশ্রম হইতে কতদূরে পৌছিয়া অশ্বপতি মনে করিলেন, "না, এরূপ উন্মত্ত লোকজন লইয়া আশ্রমে গিয়া আমার গরীব বেহাইয়ের মনে কষ্ট দিতে পারি না। বিশেষ সাবিত্রীর বিবাহসম্বন্ধে এখনও তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এইখানে সকলকে রাখিয়া, পদব্রজে যাইয়া আগে তাঁহার অনুমতি লইব।"

অশ্বপতি এই ভাবিয়া দু'একজন মাত্র মন্ত্রী ও কয়েকজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া রাজর্ষির তপোবনাভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার লোকজনেরা সেইখানেই তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা সেই কাননের মধ্যেই দিব্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া মহানন্দে নাচ গান করিতে লাগিল। কাহারও

কান অসুবিধা নাই, অসুখ নাই,—যেন তাহারা যার যার বাড়ীঘরেই আমোদ-প্রমোদ করিতেছে! তাহাদের ভীড়ে ও কোলাহলে নিস্তব্ধ কাননটী একদিনেই একটা বিরাট জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হইল।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন শুনিলেন, অশ্বপতি তাঁহার ছেলের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দিতে আসিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। হায়, আজ তাঁহারা দরিদ্র; সত্যবান্ রাজপুত্র হইয়াও আজ বনবাসী মাত্র। দরিদ্রসন্তান সত্যবানকে কে আর আজ রাজকন্যা সমর্পণ করিত? ঈশ্বর বুঝি দয়া করিয়াই আজ তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। বৃদ্ধদম্পতী মনে মনে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরকে শত-সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

তাঁহাদের আনন্দের আরও একটা কথা ছিল। কেবল যে রাজার কন্যাকে পুত্রবধূ পাইলেন, এমত নহে। অশ্বপতি পরম ধার্ম্মিক, অশ্বপতি প্রবলপ্রতাপ—তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে দ্যুমৎসেনের পূর্ব্বাপরই একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু অবস্থাবিপর্য্যয়ে এ পর্য্যন্ত সে বাসনা সফল হইয়া উঠে নাই। রাজ্যচ্যুত হইয়া

অবধি সে আশাকে তিনি একটা নেহাৎ দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে করিতেন। এখন সেই স্বপ্ন সফল হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। সাবিত্রী যখন তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কত কথাই না ভাবিয়াছিলেন! এমন রূপ, এমন গুণ, এমন শান্তশিষ্ট মেয়ে, হায়, এ যদি তাঁহাদের পুত্রবধূ হইত! কতবার, কত সময়, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা এ কথাই ভাবিয়াছেন। এখন সেই সাবিত্রীকে সত্য সত্যই তাঁহাদের পুত্রবধূরূপে পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাদের কত সুখ হইল!

কিন্তু দ্যুমৎসেন এত আনন্দিত হইয়াও অশ্বপতির প্রস্তাবে হঠাৎ সম্মত হইতে পারিলেন না। সাবিত্রী রাজার কন্যা, রাজ-আলয়ে রাজার যত্নে রহিয়াছেন; এই বনবাসে আসিলে কি তাঁহার সেই যত্ন রহিবে? সুরম্য অট্টালিকায় থাকিয়া আসিয়া, এই সামান্য কুটীরে, এই সামান্য অবস্থায়, সাবিত্রী কি স্বচ্ছন্দ অনুভব করিবেন? নানারূপ সুখাদ্য, সুপেয় দ্বারা উদর পূরণ করিয়া আসিয়া সাবিত্রী কি আজ সামান্য বন্য ফলমূল মাত্র খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন? নানাপরিজন-পালিতা নানাবেশভূষাভূষিতা রাজকন্যা আসিয়া কি

দরিদ্রের বধূ হইয়া দরিদ্রের গৃহকার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন? দ্যুমৎসেন একে একে এই সকল কথাগুলি চিন্তা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন। অথচ সাবিত্রীকে ছাড়িতেও তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। কি এক অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতার ভাব আসিয়া যেন তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরেও বিদ্রোহী করিয়াছিল।

অশ্বপতি তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার অন্তরের কথাটী বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "রাজর্ষি, আপনি কেন বৃথা ক্ষুব্ধ হইতেছেন? আমার কন্যা রাজকুমারী হইলেও, বিনীতা কষ্ট-সহিষ্ণু ও ধর্ম্মশীলা। কন্যা আমার স্বইচ্ছায়ই এ দরিদ্রাভরণ বরণ করিতেছেন, জানিবেন। সাবিত্রী রাজধানী হইতেও আপনাদের তপোবনের অধিক পক্ষপাতিনী! অতএব সঙ্কোচ করিয়া বৃথা আর আমায় ক্ষুব্ধ করিবেন না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একমাত্র কন্যা সাবিত্রীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন।"

রাজার কথা শুনিয়া রাজর্ষি কহিলেন, "মহারাজ, আপনার মত গৌরবান্বিত নৃপতির কন্যা, সাবিত্রীর মত সুশীলা বালিকা আমার পুত্রবধূ হইবে, ইহাতে আমার আপত্তির কথা কি আছে? কিন্তু আমি শুধু

আমার কথাই চিন্তা করিতেছি না, আমি এখন আপনার কথাও ভাবিতেছি। আপনি মহারাজ, রাজ-রাজেশ্বর, আমি সামান্য বনবাসী মাত্র! এ অবস্থায় আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করিয়া আপনার কি সুখ? এ দরিদ্রের ঘরে কন্যাদান করিয়া আপনি কি সম্মানিত হইবেন? না আমিই আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারিব?"

অশ্বপতি দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "রাজর্ষি, বৃথা কেন এই সব অন্যায় সন্দেহ করিয়া আমাকে অধিকতর লজ্জিত করিতেছেন? ধনৈশ্বর্য্য কত কালের? তাহাদের গৌরব কত দিনের? আপনি যে ধন অর্জ্জন করিতেছেন, তাহার তুলনায় এই সব পার্থিব ধন-রাজ্য কি ছার! আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে এত আগ্রহান্বিত হইয়াছি। আমাদের বিনীত অনুরোধ আর আপনি সাবিত্রীকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে বিমুখ করিবেন না। সাবিত্রী সত্যবানকে ভিন্ন আর কাহাকেও বরণ করিবেন না—মা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।"

তখন রাজর্ষি আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। অশ্বপতি তাঁহাকে যতদূর সম্মানিত করিবার করিলেন।

অশ্বপতি তাঁহার প্রতি এমন বিনীত, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন তাঁহার এই কথা গুলি শুনিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। দ্যুমৎসেন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অশ্বপতিকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। উভয়ের সেই অকৃত্রিম আলিঙ্গনের মধ্যে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল।

৩

তার পর একদিন সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইল। সাবিত্রী ও সত্যবান্ উভয়েই উভয়কে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। যেন দুইটী পারিজাত কুসুম একত্র গ্রথিত হইয়া একটী সুন্দর তোড়া রচিত হইল।

এই বিবাহে অশ্বপতি খরচপত্রের ক্রটী করিলেন না। একমাত্র কন্যা সাবিত্রী, তাঁহার বিবাহ—তাও আবার তাঁহাকে বনবাসীর হাতে সঁপিয়া দিতেছেন—খরচ পত্র না করিবেন কেন? অশ্বপতি নানারূপ রত্নালঙ্কারে ও মূল্যবান্ মূল্যবান্ যৌতুকে রাজর্ষির আশ্রমখানি পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মুনিঋষিরা ও

তাঁহাদের পরিজনবর্গ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই সকল জিনিস গুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু হায়, তাঁহারা কাননবাসী তপস্বী মাত্র, সেই সকল রত্নালঙ্কার দিয়া তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহারা কেবল দেখিয়া শুনিয়াই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

সেই দিন অন্ধমুনি ও অন্ধমুনিপত্নীর যে আনন্দ তাহা কে কহিবে? কত কালের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা সেইদিন তাঁহাদিগের পূর্ণ হইল! রাজ-কন্যা সাবিত্রী সত্য সত্যই অবশেষে রাজ্যচ্যুত সত্যবানের সহধর্ম্মিণী হইলেন—বনবাসীর এ আনন্দের পরিমাণ করা দুঃসাধ্য! তাঁহাদিগের বংশ-গৌরব ও কুলমান উভয়ই রক্ষা পাইল। দুঃখ বলিতে রাজর্ষির একটী মাত্র দুঃখ রহিল—এমন দিনেও তিনি পুত্রবধূর মুখখানি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিলেন না। জগদীশ্বর তাঁহাকে চক্ষুহীন করিয়া সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি কেবল লোকের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াই পুত্রবধূর গুণগ্রাম ও দেবীভাবের পরিচয় লইতে লাগিলেন। সাবিত্রীর কেমন রং, কেমন চোখ, কেমন নাক, কেমন মুখ, চুল কত বড়, দাঁত কত টুকু, সাবিত্রী কি খায়, কি ভালবাসে, কেমন করিয়া হাঁটে, কেমন

করিয়া বসে—ইত্যাদি কত বার কত জনকে কত কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর সেই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কত আনন্দ হইতে লাগিল! পত্নী শৈব্যাও তাঁহাকে নানা সময়ে নানা কথা কহিয়া বধূর গুণগ্রামের নানা পরিচয় দিতে লাগিলেন। মহর্ষির তপোবনখানি কয়েক দিনের জন্য হাসি, আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের হিল্লোলে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

বিবাহে কিরূপ ঘটা হইয়াছিল, তাহার কথা হয়ত পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ জানিতে উৎসুক হইয়াছেন। ঘটা যে খুবই হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ কি? অশ্বপতি মনে করিয়াছিলেন তপোবনে আসিয়া নেহাৎ সাদাসিদে ভাবেই কন্যাকে সমর্পণ করিয়া যাইবেন, কিন্তু প্রজাদের দৌরাত্ম্যে ফল তাহার বিপরীত হইল। রাজার কথা আর কে শোনে? সকলেই নিজ নিজ ধনরত্নাদিব্যয়ে আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিল। যাহাদের ধনরত্ন জুটিল না, তাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া নাচিয়া গাহিয়াই আশ্রম-খানিকে মাথায় করিয়া তুলিল। বনের অন্যান্য মুনি-ঋষিগণ এবং তাঁহাদের ছেলে মেয়েরাও এ উৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। আমোদ হয় না হয় না,

করিয়াও আমোদের একবারে একশেষ হইয়া গেল। মুনিঋষিরা সেই দিন তাঁহাদের ফলমূলাভ্যস্ত উদরে অনেকগুলি রসগোল্লা, পান্তোয়া ও গজা প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের ছেলে মেয়েরাও সে দিন অনেক সন্দেশ হজম করিতে যাইয়া একটু আধটু অসুখে ভুগিল। ঢাক-ঢোল ও জগঝম্পের বাদ্যে সে কয় দিন আশ্রমবাসী তপস্বীদের তপঃসাধনের বিস্তর বিঘ্ন ঘটিল। কিন্তু তবু তাঁহারা সকলেই হৃষ্টমনে আসিয়া সাবিত্রী ও সত্যবানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে ভুলিলেন না। পশু-পক্ষীরাও সে দিন আশ্রমে নানা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদের নানারূপ সুমধুর চীৎকার-ধ্বনিতে, গানে এবং অঙ্গভঙ্গিতে আমোদের ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের সেই অকৃত্রিম আনন্দের অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গি ভাষায় কখনও চিত্রিত হইবার নহে। আমরা মোটামুটি—একদিন শুভদিনে ও শুভক্ষণে নানা আনন্দধ্বনির মধ্যে সাবিত্রী ও সত্যবানের অপূর্ব্ব মিলন হইল—এই কথা বলিয়াই এ অধ্যায়ের ইতি করিলাম।

১

আমরা এতক্ষণ সাবিত্রীকে এক-ভাবে দেখিয়াছি, এখন অন্যভাবে দেখিব। সাবিত্রী এতদিন কুমারী ছিলেন, এখন বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াছেন। দেব-দ্বিজে অপূর্ব্বভক্তিমতী কুমারী সাবিত্রী যৌবনে

স্বামিগৃহে প্রবেশ করিয়া কিরূপে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের কুললক্ষ্মীদিগের প্রত্যেকেরই বিশেষ জানিবার বিষয়।

সাবিত্রী পতিগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কি করিলেন, দেখ।

অশ্বপতি যাইবার কালে সাবিত্রীকে যথেষ্ট রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গিয়াছিলেন—এ কথা বলা হইয়াছে। সাবিত্রী প্রথমে আসিয়াই সেই সব রত্নালঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া রাখিয়া দিলেন।

সাবিত্রী বিচার করিলেন, এতদিন তিনি রাজকুমারী ছিলেন, কিন্তু এখন তো আর তাহা নহেন, এখন তিনি বনবাসিনী। বনবাসিনীর এত রত্নালঙ্কারে প্রয়োজন কি? সাবিত্রীর শ্বশুর বনবাসী, শাশুড়ী বনবাসিনী, স্বয়ং সত্যবান্ জটাবল্কলধারী—সাবিত্রী কি এ অবস্থায় রত্নালঙ্কার পরিয়া থাকিতে পারে?—ছিঃ!

সাবিত্রী এইরূপ বিচার করিয়া পিতৃদত্ত সকল আভরণগুলিই পিতার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে একে একে খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। খুলিয়া রাখিয়া দিয়া সত্যবানের অনুযায়ী একখানি মাত্র সামান্য বল্কলে আপনার কমনীয় দেহ আবৃত করিলেন।

তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বনের মুনি-ঋষিগণ সকলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ীও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সাবিত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ী এ দৃশ্য দেখিয়া যেমনই সুখী হইলেন, তেমনি কষ্টানুভবও করিলেন। তাঁহাদের হৃদয় স্নেহে ও করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল। তাঁহারা ভাবিলেন, হায়, রাজকন্যাকে আজ তাঁহাদের হাতে পড়িয়াই যত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহারাও তো একদিন রাজারাণী ছিলেন। আজ যদি তাঁহাদের সেই অবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এই সুশীলা সাবিত্রীকে লইয়া তাঁহারা কতই না সুখী হইতেন!

তাঁহারা এই ভাবিয়া দুঃখিত অন্তরে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। মুক্তাফলের ন্যায় সেই পবিত্র অশ্রুবিন্দুগুলি সাবিত্রীর মস্তক সিক্ত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে চিরকল্যাণ-মণ্ডিত করিয়া তুলিল।

হায়, এই পবিত্র অশ্রু, এই পবিত্র আশীর্ব্বাদ, আমাদের দেশে আজকাল কত দুর্ল্লভ! আমাদের কুলবধূদিগের গুণগ্রামে আজিও অনেক শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সে অশ্রুতে আর এ অশ্রুতে কত প্রভেদ! আমাদের সমাজের

গুণে আমাদের দেশের অনেক ধনিকন্যাই আজকাল দরিদ্র-ঘরে প্রবিষ্টা হইতেছেন; কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক ধনী বক্তিই আজকাল বাধ্য হইয়া আপনাদিগের একান্ত আদরযত্ন-পালিতা দুহিতাদিগকেও গরীবের হাতে সমর্পণ করিতেছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের কন্যা-দের মধ্যে কয়জনে তা'দের ধনীর মেজাজটী পিত্রালয়ে পরিত্যাগ করিয়া যান? কয়জনেই বা এই সাবিত্রীর মত পিতৃধনাভিমান বিস্মৃত হইয়া স্বামীর সৌভাগ্যেই আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন?

সাবিত্রী এইরূপে সকল বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া রাখিলে, তাঁহার শাশুড়ী আসিয়া কহিলেন, "মা, তুমি রাজকন্যা হইয়াও এমন দীনহীন বেশ ধারণ করিয়াছ —ইহা আমি দেখিতে পারি না। আমরা তো মা বহুদিন হইতেই এইভাবে আছি, আমাদের আর কষ্ট কি? তুমি মা হঠাৎ এরূপভাবে এত কষ্ট করিও না। অলঙ্কারগুলি গায়ে পরিয়া রাখ।"

কিন্তু সাবিত্রী শাশুড়ীর সে কথায় কোনও উত্তর করিলেন না; কেবল চক্ষু নত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী বনবাসী—স্বয়ং সত্যবান্ জটাবল্কল-ধারী—সাবিত্রী কিরূপে সে কথা শুনিবেন? শাশুড়ী

কত কহিলেন, কত বুঝাইলেন, কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু সাবিত্রী নীরব!

সাবিত্রী কেবল অবনতমুখী হইয়া রহিলেন, আর মনে মনে কহিলেন,—"এ তুচ্ছ অলঙ্কার দিয়া আমার কি হইবে? এ সামান্য অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে আজ আমি যে অমূল্য অলঙ্কার পাইয়াছি, তাহাতেই আমার আনন্দ, তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শোভা! এই অলঙ্কার চিরকাল পরিয়া থাকিতে পারিলেই আমি সুখী! নতুবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অলঙ্কারেও আমার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইবে না। এ অলঙ্কারের তুলনায় সে সকল অলঙ্কারই অতি তুচ্ছ।

অতি সত্য কথা! অতি উত্তম কথা! আমরাও বলি তাই। স্বামীই স্ত্রীর এক মাত্র সম্পদ্! যে স্ত্রী এই আভরণ, এই শোভা, এই সম্পদ্ যত্নপূর্ব্বক অধিকার করিয়া থাকিতে পারে, সেই তো প্রকৃত সুখী, সেই তো প্রকৃত সৌন্দর্য্যময়ী, সেই তো প্রকৃত মানুষ! যে স্ত্রী এ আভরণের, এ শোভার, এ সম্পদের মর্য্যাদা বুঝে না, জানে না, সে তো মানুষ হইয়াও পশুর অধম, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, হীরকখণ্ড ফেলিয়া কাচখণ্ডের প্রতিই অনুরাগিণী—তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

সাবিত্রী যে শ্বশুরঘর করিতে আসিয়া কেবল অলঙ্কার-গুলিই ছাড়িয়া রাখিলেন, তাহা নহে। সাবিত্রী বন-বাসীদের সংস্রবে আসিয়া সত্যসত্যই সম্পূর্ণ বনবাসিনী হইলেন। বিবাহিতা হইলে মেয়েরা শ্বশুরঘর করিতে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় কাঁদে। সাবিত্রী কাঁদিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। পিতা-মাতার জন্য দুঃখ দশ জনের যেমন হয়, সাবিত্রীরও অবশ্য তেমন হইয়াছিল। এমন পিতামাতা, এমন পিতৃমাতৃপরায়ণা কন্যা, দুঃখ খুব হওয়ারই কথা। কিন্তু তজ্জন্য সাবিত্রীকে ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা কখনও কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করিতে দেখি নাই! আজকাল বড় লোকের কন্যারা ছোট ঘরে পড়িলে, প্রায়ই প্রথম প্রথম পিত্রালয়ে দিন কাটায়। কাজ-কর্ম্ম করিতে হইবে বলিয়া, চোখের আড়াল করিবেন বলিয়া, পিতামাতাও সহজে কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইতে চান না—এ বড় কুপ্রথা। বিবাহের পর স্বামিগৃহই স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়। স্বামিসেবা, শশুর-শাশুড়ীর সেবাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে রমণী এ কথাটা বুঝেন না, বা বুঝিয়াও পিত্রালয়ে থাকিতে চান, যে পিতামাতা এ কথাটা মানেন না, বা মনে মনে মানিয়াও

অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া কন্যাকে জোর করিয়া স্বালয়ে রাখেন, তাঁহারা আজ এই সাবিত্রী-চরিত্র দেখিয়া একটু শিক্ষালাভ করুন।

সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও, দরিদ্র শ্বশুরের ঘরে আসিয়া দু'দিনেই আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইলেন। বুঝিয়া অপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি—তাঁহার অতুল সম্পত্তি! সাবিত্রী ইচ্ছা করিলেই সেখানে যাইয়া অনেকদিন থাকিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু সাবিত্রী তাহার নামও করিলেন না। বিবাহের পরে সাবিত্রী এক দিনের জন্যও পিত্রালয়ে গেলেন না। যে দিন তাঁহার বিবাহ হইল, সেই দিন হইতেই তিনি স্বামীর সংসারের সহিত এক হইয়া গেলেন। এতদিন প্রাণ দিয়া পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন, এখন হইতে সাবিত্রী প্রাণ দিয়া শ্বশুরালয়ের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা, আশ্রমের তত্ত্বাবধান, দেবতার পূজাহ্নিক, পতির মনোরঞ্জন—ইহারাই তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম হইল।

সাবিত্রী প্রত্যহ প্রাতে দেবতাকে স্মরণ করিয়া ঘুম হইতে উঠে, পতিকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়,

মুখ-হাত ধুইয়া, স্নান করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য বনে বনে সখিদের সঙ্গে পুষ্প-সংগ্রহ করে, শ্বশুর-শাশুড়ীর পূজাহ্নিক সম্পন্ন হইলে, স্বহস্তে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া দেয়। তারপর সত্যবান্ বনাহরণ করিয়া কোনও দিন বা কাষ্ঠভার, কোনও দিন বা ফলমূল প্রভৃতি লইয়া আসিলে, স্বহস্তে তাহা নামাইয়া লইয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করে; পরে পতিকে স্নানাহার করাইয়া বেলাশেষে নিজে কিঞ্চিৎ খায়—এইভাবে সাবিত্রীর দিন যায়।

পূর্ব্বাহ্নে নবরবির কিরণে তপোবনখানি যখন হাসিয়া উঠে, সত্যবান্ যখন কুঠার হস্তে বনে যায়, সাবিত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ী যখন প্রিয়তমা বধূর কষ্টসংগৃহীত পুষ্পরাশির মধ্যে ইষ্টদেবারাধনায় হতচেতন হইয়া থাকেন, তখন সাবিত্রী পুষ্পমাল্য, আম্র-পল্লব ও দেবতার ঘটটী লইয়া গৃহান্তরালে, আশ্রমের এক নিভৃত প্রান্তে গমন করে। সেইখানে লতাগুল্মমণ্ডিত বৃক্ষাদির শ্যামল ছায়ায় সাবিত্রী একান্ত মনে পতির মঙ্গলকামনায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করে। আবার বৃদ্ধ-দম্পতীর পূজাসমাপ্তির ও পতির প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমে ফিরিয়া আসে। সাবিত্রীর মনের কথা মনেই থাকে—কেহই জানিতে পায় না।

"সাবিত্রী একান্তমনে পতির মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করে।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta

অপরাহ্নে ঋষিবালকগণ যখন একত্রিত হইয়া বেদগান করেন, তখন সাবিত্রীর বিশ্রামের কাল। সাবিত্রী তখন আত্মপ্রাণ ভুলিয়া কেবলই সত্যবানের দিকে চাহিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন যে পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিয়া সাবিত্রী জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিল, সাবিত্রী রোজ রোজ সে পবিত্রতামাখা মুখ দেখিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—প্রত্যহ কেবল একদৃষ্টে, অনিমেষ নয়নে সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, আর কি এক উৎকটানন্দে তাঁহার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সে আনন্দ আমি গরীব, অক্ষম গ্রন্থকার, অকিঞ্চিৎকর লেখনীহস্তে কিরূপে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব? আমার পাঠিকাঠাকুরাণীদের মধ্যে যদি কেহ কখনও পতির মুখ দেখিয়া জগৎ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তবে তিনিই উহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।
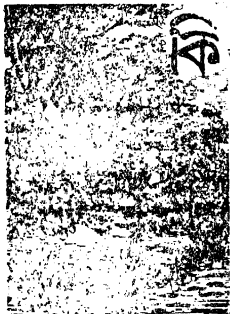
কিন্তু এত করিয়াও, এত আনন্দের মধ্যেও—সাবিত্রীর মনে এক বিষম চিন্তা চাপিয়া রহিয়াছে—সেই ঋষি-বরের ভয়ানক কথা! 'এক বৎসর পরে, ঠিক এমনি কালে, এমনি দিনে, এমনি তিথিতে সত্যবানের মৃত্যু হইবে';—কি ভয়ানক কথা! এমন পতি, এমন শ্বশুর-শাশুড়ী, এমন সুখ-শান্তির সংসার,—সাবিত্রী তো ইহাদের তুলনা জগতে খুঁজিয়া পায় না! এই সংসার তাঁহার একটী মাত্র বৎসর পরেই একবারে শ্মশানে পরিণত হইবে—কি নিদারুণ বিধিলিপি! সাবিত্রী খায় দায় কাজ করে, পতির মুখপানে চাহিয়া আপনা বিস্মৃত হয়, কিন্তু তবু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পায় না।

সকলের স্কন্ধে সেই চিন্তা চাপিয়া রহিয়াছে—কোনও রূপে সেই কথা বিস্মৃত হইতে পারে না।

সাবিত্রী দিনের বেলায় নিজের কর্ত্তব্য করে, আর সারারাত্রি জাগিয়া কেবলি পতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, আর কেবল জোড়করে দেবতাদিগকে ডাকে—"হে দেবতাসকল, আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা কর! আমার একটী মাত্র ভিক্ষা! সেই ভিক্ষা আমায় দাও। এই স্বামীর জীবন, আর কিছুই না—আর আমি কিছুই চাই না; তৎপরিবর্ত্তে আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। স্বামী না বাঁচিলে, আমি বাঁচিব না, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীও বাঁচিবেন না—আমার এমন সংসার একবারে শ্মশান হইয়া যাইবে;—হে প্রভো, আমায় এ সুখে বঞ্চিত করিও না—আমায় রক্ষা কর!"

সাবিত্রী কেবল কাঁদে, আর এই ভাবে দেবতাদিগকে ডাকে। চোখের জল পড়িয়া তাহার উপাধান-বল্কল সিক্ত হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সুপ্ত সত্যবানের বক্ষেও উহার দু'এক বিন্দু পড়িয়া জ্যোৎস্নালোকে মুক্তাফলের মত জ্বলিতে থাকে। উদ্‌ভ্রান্ত সাবিত্রী তাহা টের পায় না; নিদ্রিত, অজ্ঞাত সত্যবান্ তাহা জানিতে পারেন না;—এই ভাবে রাত্রি কাটে।

প্রভাতে উঠিয়া বনে যাইবার কালে সত্যবান্ ডাকে,—সাবিত্রি! সাবিত্রী আবার তাঁহার দিকে চাহিয়া সকল বিস্মৃত হয়। এমন স্বামীও তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে? দুর—এও কি সম্ভব? সাবিত্রী আবার মন বাঁধিয়া আপন কাজ করিতে যায়। এত চিন্তার মধ্যেও সাবিত্রী কর্ত্তব্য কার্য্যে এতটুকুও অবহেলা করে না, বা মুখে কখনও কোনও অপ্রফুল্লতার ভাব আনে না—পাছে, সত্যবান্ বা শ্বশুর-শাশুড়ী কেহ টের পান! নিরর্থক কেন সাবিত্রী তাঁহাদিগকে পীড়িত করিবে? সাবিত্রী তাহা প্রাণান্তেও হইতে দেয় না।

যখন একান্ত যাতনা হয়, তখন সাবিত্রী নিকটবর্ত্তিনী মুনিপত্নী ও মুনিবালিকাদিগের নিকটে যাইয়া নানা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করে। বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের নিকটে ধর্ম্মকাহিনীর মত এমন বন্ধু বুঝি আর নাই। ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে সাবিত্রী সকল বিপদ্ বিস্মৃত হয়। তাহার আসন্নপ্রায় চক্ষের জল শুকাইয়া যায়।

এইভাবে সাবিত্রীর পত্নী-জীবন অতিবাহিত হয়।

সাবিত্রীর বরলাভ

১

এইবার আমরা সাবিত্রী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান অংশে উপনীত হইয়াছি। সাবিত্রী-চরিত্রের প্রকৃত মহিমা, প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত তেজ এই অংশেই সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই অংশে সাবিত্রী নিজ:তেজোবলে

যে অপূর্ব্ব ও অলৌকিক কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে আর নাই। সতীর মহিমা যে কত শক্তিসম্পন্ন, কত উজ্জ্বল, সতীর তেজ যে কত প্রচণ্ড, তাহা এই অংশ পাঠ করিলেই পাঠিকাঠাকুরাণী বিশেষ অবগত হইবেন। এই শক্তি ও তেজোবলে সাবিত্রী যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য সকল শক্তির সমষ্টিতেও সে কার্য্য আর হইবার নহে। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, সতীর মাহাত্ম্য কত বড়!

সাবিত্রীর বিবাহের পর ক্রমে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; বৎসর পূর্ণ হইতে আর কয়দিন মাত্র বাকী—সাবিত্রী বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!

সাবিত্রীর চঞ্চলতার ভাব কাহারও নিকটে গোপন রহিল না। এমন শান্তশিষ্টা বুদ্ধিমতী বধূকে মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কা ও ভ্রমাবিষ্টা হইতে দেখিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে এই চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কি উত্তর দিবেন? সে সাংঘাতিক কথা কহিয়া কি সাবিত্রী বৃদ্ধ-দম্পতীকে কাতর করিতে পারেন? সাবিত্রী কোনও উত্তর করিলেন না। সাবিত্রীর শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

সাবিত্রীকে দিন দিন মলিন ও ক্ষীণ হইতে দেখিয়া সত্যবান্ এক দিন তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সাবিত্রি, একি! তুমি দিন দিন এত ক্ষীণা ও রুগ্না হইতেছ কেন? তুমি রাজকন্যা, আসিয়া অবধি নানা কষ্ট সহ্য করিতেছ, বোধ হয় তাহাতেই তোমার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আর এত পরিশ্রম করিও না। তোমার চেহারা দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে।"

সত্যবানের কথা শুনিয়া সাবিত্রীর চক্ষে জল আসিল। হায়, সত্যবান্ জানেন না যে, তাঁহার ভয় হইতে সাবিত্রীর মনের ভয় কত বেশী! সাবিত্রী মুখ ঘুরাইয়া অশ্রু গোপন করিয়া ফিরিয়া কহিলেন,— "প্রিয়তম, তোমাদের সেবা-শুশ্রূষা না করিলে আমার শরীর আরও খারাপ হইবে। তুমি চিন্তিত হইও না, আমার পীড়ার অন্য কারণ আছে। আমি কোনও উৎকট ব্রত ধারণ করিয়াছি। সে ব্রত শেষ হইতে আর চারি দিন মাত্র বাকী। আগামী কল্য হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া আমি এ ব্রত সমাপ্ত করিব। তার পর আর কোনও কষ্ট থাকিবে না। তুমি শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট আমার এ কথা কহিও।"

সাবিত্রী প্রায়ই নানা ব্রত-পূজাদি করিতেন, সুতরাং সত্যবান্ সাবিত্রীর এ কথায় বড় বিস্মিত হইলেন না। কিন্তু তিন দিন উপর্য্যুপরি উপবাস!—এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! একে সাবিত্রীর এই শরীরের অবস্থা, তা'র উপর আবার এরূপ দীর্ঘ অনশন—সত্যবান্ সাবিত্রীকে সেই কথা কহিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সাবিত্রী সেই কষ্টের কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, এবং নানা প্রকারে অনুনয়-বিনয় করিয়া সত্যবানের সম্মতি যাজ্ঞা করিলেন। সত্যবান্ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

সত্যবান্ যাইয়া পিতা-মাতার নিকটে সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রতের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও সাবিত্রীর এই দীর্ঘ ক্লেশের কথা শুনিয়া বিশেষ ভীত হইলেন। কিন্তু দ্যুমৎসেন পরম ধার্ম্মিক; দেবতার কাজে কি করিয়াই বা তিনি সাবিত্রীকে বারণ করিবেন? তিনি তো কখনও কাহাকেও দেবতার কাজে কোনও প্রকারে বাধা দেন নাই। কাজেই, তিনিও সম্মত হইলেন। সাবিত্রী সত্যবানের কল্যাণার্থে ব্রত করিবেন শুনিয়া শাশুড়ীও আর বড় একটা আপত্তি করিলেন না—অনুমতি দিলেন। সাবিত্রী নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সাবিত্রী একে একে সকল দেবতাদিগকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ডাকিয়া পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক শ্বশুর-শাশুড়ী ও সত্যবানকে প্রণাম করিয়া যথাকালে ব্রতারম্ভ করিলেন। উঃ! সে কি সাংঘাতিক ব্রত! সে ব্রতের কঠোরতার কথা আর তোমাদিগকে কি বলিব? এমন করিয়া ব্রত করিতে পারিলে, এমন একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে ডাকিলে, দেবতার আসন না টলিবে কেন? আমরা ডাকিতে জানি না, তাই না আমরা দেবতাকে পাই না, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হই! দেখ দেখি, সাবিত্রী কি নিবিষ্ট মনে আরাধনা করিতেছে। বাহ্যিক প্রকৃতি বুঝি তাহার নিকটে লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহার অন্তর বুঝি ওই জড় দেহ ছাড়িয়া কোনও দুরদূরান্তরে বল সঞ্চয় করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে! দেখ, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির, নিশ্বাসপ্রশ্বাসও বুঝি প্রায় লুপ্ত! উঃ! এই না প্রকৃত সাধনা?

ধন্য সাবিত্রী, ধন্য! নারীকুলে তুমিই ধন্য! তোমার এ পবিত্র একাগ্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পতিভক্তি জগতের ঘরে ঘরে আমাদের বঙ্গ-ললনাদের অন্তরে অন্তরে আবার মা আজ জাগিয়া উঠুক। তোমার পুণ্যমন্ত্র

যুগ হইতে বহুদূরে এই কলি-কালের ঘোর সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া আবার মা আমরা আর একবার আমাদের ঘরে ঘরে তোমার ঐ পবিত্র মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিয়া ধন্য হই।

ক্রমে এক দিন, দুই দিন করিয়া ব্রতের তিন দিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে সাবিত্রী স্নানাহ্নিক করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, তখন সত্যবান্ আশ্রমের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সাবিত্রী তখন এক উজ্জ্বল অপূর্ব্বতেজোমণ্ডিত মূর্ত্তি লইয়া শীর্ণকলেবরে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ও শীর্ণ দেহ দেখিয়া সত্যবান্ স্থির নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি! সত্যবান্ ভাবিলেন, সাবিত্রী বুঝি মানুষ নয়; তাহার চারিদিকে এক দেবতার তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সত্যবান্ তখন কুঠার হস্তে বনে যাইতেছিলেন; রাত্রির জন্য কাঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করিতে হইবে। সাবিত্রীর সেই উজ্জ্বল-কান্তি দেখিয়া কতক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

সত্যবানকে সেইরূপে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন।

তারপর তাঁহার নিকটে সেই কুঠারখানা দেখিয়া হঠাৎ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কোথা যাইতেছ? বেলা শেষ হইয়া আসিল, এখন এই কুঠার হাতে কেন?"

সাবিত্রীর এই ব্যগ্রভাব দেখিয়া সত্যবান্ আরও আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি তাহার দিকে এবার আরও অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সাবিত্রী সেই অবাক্ দৃষ্টি দেখিয়া একটু হাসিলেন। সাবিত্রী হাসিতেছে, তাহার উদ্বেগপূর্ণ মুখের বিষাদিত ভাবটীর সহিত মিশিয়া সে হাসি একটু অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সত্যবান্ কহিলেন, "সাবিত্রি, তুমি দেবী না মানবী? তিন দিন উপবাসী রহিয়াছ, তোমার যে আয়ু শেষ হইয়া আসিল। যাও, এখন যাইয়া আহার কর—ব্রত তো সমাপ্ত হইল।"

সাবিত্রী কহিলেন, "না, রাত্রি প্রভাত না হইলে খাইব না। আমার তো কোনও কষ্ট নাই, তবে তুমি এত চিন্তিত হইতেছ কেন? এখন বল কোথায় যাইতেছ।"

সত্যবান্ কহিলেন, "ঘরে কাষ্ঠ নাই, ফলমূলও নাই;—খাইবে কি? বনে যাইব।"

সাবিত্রী উদ্বিগ্না হইলেন। কিন্তু সত্যবানের নিকটে সে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া

কহিলেন, "আমার জন্য তুমি এমন সময়ে বনে যাইবে! তাহা হইবে না। ভাল, আমি তো খাইব না শুনিলে; তবে আর বনে যাইবার প্রয়োজন কি? যাহা আছে, তাহা দ্বারা তোমাদের হইলেই হইল। আমার মাথা খাও, আজ আর কোথাও যাইও না।"

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া সত্যবান্ এবার আরও আশ্চর্য্য হইলেন। আবার তিনি কতক্ষণ তাহার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের কথাই বটে! সাবিত্রী তো কোনও কালেই এমন করিয়া সত্যবানকে কোনও কাজে বাধা দেন নাই! তবে আজ তাহার এ ভাব কেন?

সত্যবান্ উত্তর করিলেন, "আমাদেরও আহার্য্য নাই। বিশেষ কাষ্ঠের অভাবে পিতামাতার যাগযজ্ঞ নষ্ট হইতে বসিয়াছে—আমাকে যাইতেই হইবে।"

সাবিত্রী অগত্যা ইহার উপর আর সত্যবানকে বাধা দিতে পারিলেন না। শ্বশুর-শাশুড়ী উপবাসী রহিবেন, স্বামী অনশনে থাকিবেন, দেবতারও কাজ হইবে না—সত্যবানকে বাধা দিবার তিনি কে? অগত্যা তিনি প্রস্তাব করিলেন, তিনিও সত্যবানের সঙ্গে সঙ্গে কাননে যাইবেন। সাবিত্রী অনেক দিন কানন দেখেন নাই,

এই সময়ে কাননের শোভা নাকি বড় সুন্দর! সাবিত্রীর সে শোভা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে। সত্যবান্ কি তাহার এ সাধ পূর্ণ করিবেন না?

ইহার উপর 'না' চলে না। কিন্তু সাবিত্রী বড় দুর্ব্বল! তিন দিন অনাহারে রহিয়াছেন, তা'র উপর আজ এখনও খাওয়া হয় নাই—সত্যবান্ এই কথা কহিয়া একটু বাধা দিতে চাহিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাহা কানেই তুলিলেন না, বার বার কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অগত্যা সত্যবান্ স্বীকৃত হইলেন।

সত্যবানের নিকট প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকটে যাইয়া সেই কথা পাড়িলেন। তাঁহারাও সাবিত্রীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। এই ত্রিরাত্র-ব্যাপী ভয়ানক পরিশ্রম, তা'র উপর এই অনাহার, আবার তার পরেই এই সন্ধ্যা সম্মুখীন করিয়া কাননে প্রবেশের আগ্রহ! এর অর্থ কি? সাবিত্রী বুঝি পতি-চিন্তা করিতে করিতে পাগলিনী হইবেন! সাবিত্রী তো আর কখনও তাঁহাদের নিকটে এমন করিয়া একটীও প্রার্থনা করেন নাই, সাবিত্রী তো এ পর্য্যন্ত এক দিনও আশ্রমের বাহির হন নাই—তবে আজ তাঁহার এমন অসময়ে এমন প্রার্থনা কেন?

বৃদ্ধ-দম্পতী বুঝিলেন, সতী-সাধ্বী পুত্রবধূ স্বামীর মঙ্গল-কামনাতেই এই যাত্রা করিতেছেন। পুত্রের মঙ্গল-কামনা এবং পুত্রবধূর এই সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ তখন তাঁহাদের মনখানিকে একবারেই অভিভূত করিয়া ফেলিল—সেই উভয় স্রোতে তাঁহাদের আপত্তির কারণগুলি একে একে তখন কোথায় ভাসিয়া গেল—তাঁহারাও তখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

২

সাবিত্রী ব্রত সমাপ্ত করিয়াছেন, ব্রত সমাপ্ত করিয়া স্বামিসহ বন প্রবেশ করিতেছেন, সম্মুখে চতুর্দ্দশীর ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি—কে জানে এই ঘোর রাত্রিতে সেখানে আজ সাবিত্রীকে কি অভিনয়ই করিতে হইবে! সাবিত্রী তাই গমনকালে সকল দেবতাদিগকে ডাকিয়া লইলেন ও একে একে সেই কাননস্থ সকল ঋষি ও ঋষিপত্নিগণকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। অঙ্গিরা, মাণ্ডব্য, গৌতম প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ সেই কাননে

বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে "চির সধবা থাক মা" এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাবিত্রী স্বামীর জীবনের জন্য অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিতে যাইতেছেন, এই সময়ে এই শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁহার নিকটে যেন একটা শুভ দৈববাণী ও দেবদত্ত ধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হইল। মুনিঋষিদের আশীর্ব্বাদ একটা অক্ষয়কবচরূপে ধারণ করিয়া সাবিত্রী পতিসহ বনপ্রবেশ করিলেন।

ঘোর গহন কানন, তা'র মধ্যে সরু বনপ্রবেশের পথ। শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, চারিদিক আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। সে শোভা বড় সুন্দর, বড় ভয়ানক! সৌন্দর্য্য ও বিভীষিকার মেশামেশি কেমন প্রাণস্পর্শী, তাহা কখনও দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। নিস্তব্ধ কানন, চারিদিকে হিংস্র জন্তু! সন্ধ্যার আগমনে বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্ধকার জমাট হইয়া আসিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রালোক মাত্র ভরসা করিয়া সাবিত্রী ও সত্যবান্ হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করিতেছেন, কিন্তু তবু তা'তে কেমন একটু প্রকৃতির অপূর্ব্বতা মাখা! সেই অন্ধকার রাশির মধ্যে লতায় লতায় ফুল, পাতায় পাতায় শ্যামল শোভা,

ডালে ডালে পাখী। সত্যবান্ কুঠার স্কন্ধে রাখিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া সাবিত্রীকে সে সকল দেখাইতেছিলেন।

কিন্তু সাবিত্রীর চক্ষে আজ কোন শোভাই নাই। সত্যবান্ দেখাইতেছেন, সাবিত্রী জোর করিয়া হাসিয়া, চক্ষু উঠাইয়া সকলই দেখিতেছেন; কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। কখনও কখনও বা সত্যবানের কথার দিকেই সাবিত্রীর লক্ষ্য নাই। সত্যবান্ একদিকে দেখাইতেছেন, সাবিত্রী হয়ত অন্য-মনস্কভাবে অপর দিকেই চাহিয়া রহিয়াছেন,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না!

সত্যবান্ কহিতেছেন, "দেকেচ, কি সুন্দর ফুল?"

সাবিত্রী চাহিয়া কহিতেছেন—"হাঁ প্রিয়তম, দেখিতেছি।"

সত্যবান্ একবার কহিলেন, "দেকেচ, পাতার আড়ালে কেমন একটা পাখী?"

সাবিত্রী কহিলেন, "দেখিতেছি।"

সত্যবান্ কহিলেন, "বলতো, উহার কি রঙ?"

অন্ধকারে পাখীর রঙটা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, তাই সত্যবান্ সাবিত্রীকে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলতো, উহার কি রঙ?"

সাবিত্রী কথা কয় না। এতক্ষণ 'হাঁ' 'না' করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এখন কেবল তা'তে চলে না। সাবিত্রী কি উত্তর দিবে? সাবিত্রীর মনতো পাখীর দিকে নয়! সাবিত্রী তখন সত্যবানকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁহার হাত নিজ হাতে লইয়া, তাঁহার অঙ্গুলিগুলি নিজ অঙ্গুলিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কম্পিত কলেবরে ভাবিতেছিলেন, "হায়, এই কি শেষ? আর কি এ সুন্দর দেখিব না? এই অপূর্ব্ব রত্ন আজ কি সত্য সত্যই এই গহন কাননে চির-বিসর্জ্জিত করিয়া যাইতে হইবে?"—কাজেই সাবিত্রী সত্যবানের কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। সত্যবান্ সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, শরতের আকাশে কোথা হইতে একখণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ চাপিয়া আসিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে চারিদিক হইতে মেঘ চাপিয়া আসিলে, এক প্রান্তস্থিত শশধর যেমন আপন কিরণ-জালে জোর করিয়া প্রকৃতিকে হাসাইতে চাহেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন না, সত্যবান্ দেখিলেন, সাবিত্রীও সেইরূপ জোর করিয়া হাসিতে চাহিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সে বিষাদ-ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না।

সত্যবান্ সাবিত্রীর এই অপূর্ব্বভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা

বনপথে সাবিত্রী ও সত্যবান্।

করিলেন, "সাবিত্রি, তোমার কি কষ্ট হইতেছে? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এমন শরীর লইয়া, এমন অনভ্যস্ত কাজে হঠাৎ হাত দিও না। তা তুমি তো শুনিলে না?"

সত্যবানের কথা শুনিয়া সাবিত্রী চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি সত্যবান্ তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন? সাবিত্রী কি অনবধানতা বশতঃ পতিকে পীড়িত করিলেন?

সাবিত্রী আবার আপনাকে সতর্কতার সহিত সামলাইয়া লইলেন; এবং যথা সম্ভব দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "না প্রিয়তম, তোমার সহিত বনভ্রমণ করিতে আমার এতটুকুও কষ্ট হইতেছে না। তোমার সহিত বনভ্রমণ—এতো আমার স্বর্গ! এ দিন আর কবে হইবে? তুমি ভাবিও না—চল।"

কথা কয়টি বলিতে সাবিত্রীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল।

এই সময়ে তাঁহারা এক ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া রাত্রি হইয়াছে; নক্ষত্রের আলোক আর ভাল করিয়া কাননতলে প্রবেশ করিতে

পারিতেছে না ; চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। সম্মুখেই নানা ফল-মূলের বৃক্ষ এবং অনতি-দূরেই জ্বালানিকাষ্ঠের বন।

সত্যবান্ সাবিত্রীর কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি সেই ফলমূলের গাছগুলি হইতে কতকগুলি ফল-মূল সংগ্রহ করিলেন। তারপর সেইগুলি একটি বৃক্ষতলে রাখিয়া জ্বালানিকাষ্ঠ সংগ্রহার্থে কুঠার হস্তে একটি বৃক্ষারোহণ করিলেন। এই সময়ে সাবিত্রীর সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন একটু স্পন্দিত হইয়া উঠিল, হৃদয় যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিল, দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইল। সাবিত্রী উদ্বেগ ও আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া সেই বৃক্ষমূলে সত্যবানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ বৃক্ষারোহণ করিয়া কাষ্ঠ কাটিতে উদ্যত হইলেন। কুঠার হস্তে লইয়া একটি শুষ্ক শাখার উপরে কোপ ফেলিলেন। এক কোপ, দুই কোপ, তিন কোপ পড়িল। সাবিত্রী নীচ হইতে একাগ্রমনে সেই কোপগুলি শুনিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কোপের সঙ্গেই যেন সাবিত্রীর হৃদয়ের এক এক খানি হাড় নড়িয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তিন কোপের পরে সাবিত্রী আর শব্দ শোনে না। এক পল, দুই পল, তিন পল গেল, ক্রমে বহুক্ষণ অতীত হইল—সত্যবান্ কি করিতেছেন? সাবিত্রী উদ্বিগ্না হইলেন।

"প্রিয়তম!"

সত্যবান্ কষ্টে উত্তর করিলেন,——"সাবিত্রি, বড় শিরঃ-পীড়া!"

কি সর্ব্বনাশ! বুঝি সময় আসিল!

সাবিত্রী কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"শীঘ্র নামিয়া আইস, শীঘ্র নামিয়া আইস—আর গাছে থাকিও না। আমার মাথা খাও, শীঘ্র নামিয়া আইস।"

কিন্তু সত্যবান্ নামিলেন না। সাবিত্রী আবার ডাকিলেন। সত্যবান্ কহিলেন, "বনে কাঠ লইতে আসিয়াছি, কাঠ না লইয়া যাইব না—পিতামাতার কি হইবে?"

সত্যবান্ সকল কথা জানেন না। ভাবিতেছেন, শিরঃ-পীড়া, কতক্ষণই বা থাকিবে, তা হউক না যতই কঠিন। কিন্তু সাবিত্রী তো সব জানে। সাবিত্রী মাথার দিব্য দিল!

অবশেষে সত্যবান্ পীড়ায় কাতর হইয়া নামিতে

বাধ্য হইলেন। কিন্তু : নামিতেই সাবিত্রীর ক্রোড়ে: মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

এখন একবার তোমরা সাবিত্রীর কথা ভাব! তখন সাবিত্রীর অবস্থা কি ? কি করিয়া বুঝাইব কি ? তোমরা তো কখনও সে অবস্থায় পড় নাই, সুতরাং সে অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। আমিও তো কখনও সে অবস্থায় পড়ি নাই, সুতরাং আমিও সে অবস্থার সম্যক্ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব না। বিশেষ, তেমন অবস্থা বুঝিলেই কি ঠিক ঠিক বর্ণনা করা যায় ? একে নিবিড় বন, তা'তে চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যাইতেছে না। ইতস্ততঃ হিংস্র জন্তুগুলি শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে; তা'তে পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা জানোয়ার নানা বিকট ভঙ্গিতে চীৎকার করিতেছে। কোনও কোনও বৃক্ষের উপরে পেচক ডাকিতেছে। কোথাও কোথাও ক্ষীণ নক্ষত্রালোক অতি কষ্টে বনের পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিয়া বনপ্রবেশপূর্ব্বক সেই জমাট অন্ধকার রাশির ভিতরে কোনও একটি সামান্য বস্তুর উপরে পতিত হইয়াই নানা অলৌকিক দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে। সে ক্ষীণ আলোকরশ্মিসম্পাতে

বনের ঘোর, ঘন অন্ধকার আরও ঘনীভূত দেখাইতেছে। এই সকল বিভীষিকার মধ্যে মুমূর্ষু পতিকে ক্রোড়ে লইয়া সাবিত্রী!—কি ভয়ানক ব্যাপার!

কিন্তু সাবিত্রী এ সকল কিছুই ভাবিতেছেন না। সাবিত্রীর নিকটে তখন বাহ্যপ্রকৃতি লুপ্ত! এই সকল বাহ্যিক বিভীষিকা ও বিপদাপদের আশঙ্কা সাবিত্রীর নিকট তখন অতি তুচ্ছ। সাবিত্রী তখন কেবলই সত্যবানের কথা ভাবিতেছেন। সে কথা ছাড়িয়া বাহি-রের দিকে লক্ষ্য করিবার যেন তাঁহার বিন্দুমাত্রও অবসর নাই। সাবিত্রী তখন বৃক্ষতলে জানু বিস্তৃত করিয়া বসিয়াছেন; বসিয়া প্রিয় পতির মস্তক জানুপরি স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন ও একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। উঃ, সে কি চাহনি! সে চাহনি কি উজ্জ্বল! সেই ঔজ্জ্বল্যে সেই অন্ধকারেও যেন বনের চারিদিক প্রভাময় হইয়া উঠিল। সেই চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পতিদেহ ক্রোড়ে লইয়া এক পবিত্র আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া সাবিত্রী ভাবিতে লাগিলেন, "হায় দেবতা, একি করিলে? এই স্বামী, এই চিরপরিচিত মুখ, এই যেন কত কালের আরাধনার সামগ্রী, ইহা হইতে আমায়

অকালে বঞ্চিত করিলে? দাসীর এত আরাধনা, এত প্রার্থনা কিছুই শুনিলে না? যাঁহাকে ছাড়া হৃদয় শূন্য, দেহ অর্দ্ধেক, অস্থায়ী—সেই স্বামী আমার কাড়িয়া লইলে! যদি লইলে তবে আমাকেও সঙ্গে লইলে না কেন, প্রভো? স্বামীকে ছাড়িয়া এ শূন্যপ্রাণ লইয়া এ সংসারে আমি কেমনে থাকিব? কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি করিলে? আমি জন্মিয়া অবধি কাহাকেও কষ্ট দেই নাই; বিবাহিতা হইয়া অবধি স্বামীর মুখ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবি নাই, স্বামীর মুখ দেখিয়া অবধি আপনাকে স্বামী হইতে একটুকুও স্বতন্ত্র মনে করি নাই—আমার দক্ষিণ হস্তকেও বোধ হয় এত আপনার মনে হয় নাই—আমায় এ শাস্তি কেন দিলে? এমন স্বামী আমায় ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথা আমি কেমনে বিশ্বাস করিব? আমার হৃদয়, মন, প্রাণ, সকল ছাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী আমায় ছাড়িয়া যাইবেন,—এ কথা যে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, প্রভো! ঋষিবরের বাক্য শুনিয়াছি; আজ এক বৎসর ধরিয়া সেই কথাই ভাবিয়া আসিতেছি; —কিন্তু তবু যে বিশ্বাস করিতে পারি না, প্রভো! যত এই মুখের দিকে চাহিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে, ততই মনে হইতেছে, এই স্বামী

আমায় কখনো ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; তিনি জলে, স্থলে, ইহলোকে, পরলোকে, যেখানেই থাকুন, সেখানেই আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিব। আমার এ বিশ্বাস কি সফল হইবে না, প্রভো? আমি এত ব্রত করিলাম, পূজা করিলাম, আরাধনা করিলাম— তবু কি স্বামীকে রাখিতে পারিব না, প্রভো?"

সাবিত্রী এইরূপ ভাবিতেছেন, আর সত্যবানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন—ক্রমে সত্যবানের চিরাকাঙ্ক্ষিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে সাবিত্রীর মনে যেন কি এক অপূর্ব্ব বল জাগিয়া উঠিল। সতী যেন কোথা হইতে ক্রমে এক অপূর্ব্ব বল লাভ করিয়া অপূর্ব্বশক্তিমতী হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে যেন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল,—কিসের মৃত্যু! কিসের জীবন! তাঁহার সেই অপূর্ব্ব শক্তির নিকটে এ সকলই অলীক! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি তুচ্ছ, লোকের জীবন-মরণ অতি সামান্য, পার্থিব সুখ-দুঃখ অতি অকিঞ্চিৎকর! তিনি বোধ করিলেন, যেন জগতের যত কিছু শক্তি সকলই আজ তাঁহার নিকটে পরাজিত! চরাচর তাঁহার আজ্ঞাধীন, জলে, স্থলে, আকাশে তাঁহার সর্ব্বত্র গতি! স্বামীকে যথায় ইচ্ছা, তথায় অনুসরণ করিতে

পারিবেন—এ বিশ্বাস তাঁহার জন্মিল! সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের জ্যোতিও যেন অনেকটা বাড়িয়া গেল। সাবিত্রীর মন তখন ক্রমে সত্যবানের প্রাণটীকে আপন প্রাণের সঙ্গে এক করিয়া দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। সাবিত্রী সেই ভাবে একদৃষ্টে সত্যবানের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে ক্রমেই অধিকতর স্বামিগতপ্রাণা হইতে লাগিলেন।

সাবিত্রী এইরূপে একদৃষ্টে পতি-মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, একটু একটু করিয়া তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছে, সেই অপূর্ব্ব বিশ্বাসে তাহার মনে এক অপূর্ব্ব আশার আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সত্যবান্ পূর্ব্ববৎ সাবিত্রীর কোলে অচৈতন্ত—ক্রমে সত্যবানের শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সাবিত্রী তখন অনেকটা স্থির, ধীর, গম্ভীর! মনে বল পাইয়াছেন, অন্তরের চঞ্চলতাও ক্রমে প্রশান্তভাবে পরিণত হইতেছে,—তিনি শান্তভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মৃত্যুর ছায়া আসিয়া ক্রমে তাঁহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সে ছায়া বড় অদ্ভুত, বড় মোহময়ী। অলক্ষ্যে যেন কি একটা ইন্দ্রজাল আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী তখন আর কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না—স্পর্শশক্তিরহিতা! যেন কি এক ইন্দ্রজাল-প্রভাবে অকস্মাৎ ইহসংসারের সকল সংস্রব তাহার নিকট হইতে শিথিল হইয়া গেল। সাবিত্রী যেন হঠাৎ কোন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। চারিদিকে একি মায়াজাল! সাবিত্রীর মনে হইতে লাগিল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারের কায়াবিশিষ্ট কতকগুলি কি কিলি বিলি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! সাবিত্রী একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মূর্ত্তিগুলি ক্রমে রূপ ধরিয়া স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল—ক্রমে আকৃতি-বিশিষ্ট হইল। সাবিত্রী সভয়ে দেখিলেন, কি বিকট বিকট চেহারা! সাবিত্রী মস্তক অবনত করিলেন। আবার প্রিয় পতির মুখের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বিকট চেহারাগুলি সরিয়া গেল।

এর পর আরও কতক্ষণ গেল। এখনও সত্যবানের হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। সাবিত্রী আশার ঘর বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন অরণ্যভূমি দিব্যালোকে আলোকিত হইয়া উঠিল!

তেমন আলোক তোমরা কেউ কখনও দেখ নাই, সাবিত্রীও বুঝি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই— সাবিত্রী আবার মুখ তুলিলেন।

কিন্তু এ কি? সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিলেন। কি দিব্য অলৌকিক মূর্ত্তি! সেই অন্ধকারের ঘোর আবরণের উপর নীরদবক্ষে বিজলীর মত সাবিত্রী দেখিলেন, কি অপরূপ রূপ! কি সৌম্য আকৃতি! হস্তে পাশদণ্ড, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, চরণে রজত-খচিত পাদুকা, পরিধানে কষায় বস্ত্র!—মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম!

সাবিত্রী বুঝিলেন, ইনিই ধর্ম্মরাজ—ইনিই সেই যম, আর রক্ষা নাই, এইবার সত্যবানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সাবিত্রী করযোড়ে সেই অলৌকিক পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আপনি কে? আপনার মূর্ত্তি উজ্জ্বল, দেহ অলৌকিক, গমন অশরীরীর ন্যায় অপূর্ব্ব ও সহজ! দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোনও দেবতা হইবেন। আপনিই কি ধর্ম্মরাজ যম?"

যমরাজ সস্নেহে সাবিত্রীর প্রতি এক কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ সাবিত্রি, আমিই যম। আমিই ধর্ম্মাধিপতি, আমিই চরাচরের লয়-কর্ত্তা, আমিই কাল

মুমূর্ষু পতি-কোলে সাবিত্রী ও যম।

ফুরাইলে লোকের প্রাণ হরণ করিয়া থাকি, আমাকেই কৃতান্ত বলিয়া জানিবে। আজ আমাকেই তোমার স্বামীর প্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার কাল ফুরাইয়াছে, এখন তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর—আমি স্পর্শ করিব।”

সাবিত্রী ধীরে ধীরে সত্যবানের দেহ নামাইয়া রাখিয়া করযোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মরাজ সত্যবানের দেহ স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত প্রাণ-পুরুষটী বাহির করিয়া লইলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, “প্রভো, শুনিয়াছি আপনার দূতগণই লোকের প্রাণ হরণ করিতে আসে। কিন্তু আজ আপনাকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিতেছি—ইহার অর্থ কি ?”

যমরাজ সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। কি অপূর্ব্বা বালিকা! যম আসিয়া স্বামীর জীবন বাহির করিয়া লইতেছেন, আর বালিকা স্থির গম্ভীর ভাবে তাঁহার সঙ্গেই কথোপকথনে অনুরাগিণী,—এ দৃশ্য যমের চক্ষে বড় অদ্ভুত!

যম উত্তর করিলেন, “সাবিত্রী, তুমি অপূর্ব্বা সতী-সাধ্বী, তোমার নিকটে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারি। পাপী ও দুষ্কর্ম্মনিরত মানবগণের উপরেই আমার দূতগণের অধিকার, সাধুজনের উপরে নহে। সত্যবান্ পরম ধার্ম্মিক—তদুপরি আবার তোমার মত পতিব্রতার ক্রোড়ে শায়িত—সুতরাং তাহাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারিবে কেন? এই রকম লোকের প্রাণহরণ করা আমারই কাজ। তাই আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি গৃহে ফের—আমি বিদায় হই।"

এই বলিয়া যম সত্যবানের প্রাণ-পুরুষটিকে পাশাবদ্ধ করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু যম-রাজের বিদায় হওয়াটা যত সহজ হইল, সাবিত্রীর গৃহে ফেরাটা তত সহজ হইল না।

সাবিত্রী তখন ভাবিতে লাগিলেন, "এইবার আমি কি করি? গৃহে ফিরিব? গৃহ কোথায়? গৃহ তো আমার স্বামীরই সঙ্গে। স্বামী তো যমপুরীর দিকে চলিলেন! তবে আমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন? যমরাজ না হয় নিয়তির হুকুমে স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন— কিন্তু আমার সঙ্গে যাইতে বাধা কি? স্বামিসঙ্গ হইতে কে আমায় বিচ্ছিন্ন করিবে? আমি যাইব।"

এই ভাবিয়া সাবিত্রীও যমের পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলেন।

দেবতার হাঁটা! যম হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া নিমেষে বহু ক্রোশ পথ যাইতে লাগিলেন। পাতিব্রত্যের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! সেই শক্তির বলে সাবিত্রীও অনায়াসে যমকে অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সংসারে যাহা কেহ কখনও করে নাই, দেখে নাই, সাবিত্রী আপনার পবিত্রতায়, আপনার সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের প্রভাবে তাহাই আজ করিতে সক্ষম হইলেন। জগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপিত হইল।

৩

যম কিছু দূর যাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, সাবিত্রী! দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। একটা মানুষ দেবতাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে—যমরাজের অভিজ্ঞতায় এটা বড় নূতন! তিনি কহিলেন, "সাবিত্রি, একি! তুমি কোথায় আস্‌চো? আমার সঙ্গে যাওয়া যে তোমার অসম্ভব!

সাবিত্রী কহিলেন, "প্রভু, আমার স্বামী যেখানে যাইতেছেন, আমিও সেইখানে যাইব। স্বামিসহগমনই পত্নীর ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মই পালন করিতেছি।"

যম কহিলেন, "সাবিত্রি, সে যে হইবার নয়! মানুষের পক্ষে যত দূর সম্ভব, তুমি ততদূরই আসিয়াছ—আর আসিতে পারিবে না। এখনই তোমার চলৎশক্তি রহিত হইবে। কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ? পতির মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক ক্রিয়াই পত্নীর কর্ত্তব্য। তুমি এখন গৃহে যাইয়া সেই কাজ কর।"

কিন্তু সাবিত্রী অটল! সাবিত্রী কহিলেন, "প্রভু, গৃহের কথা কহিতেছেন? গৃহ আমার কৈ? গৃহ তো আমার এখন আপনারই সঙ্গে। জীবনে মরণে নারীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল পতি। আপনি তো এখন আমার সেই আশ্রয়স্থলই কাড়িয়া লইতেছেন। তবে আর আমি কোথায় যাইব?"

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজের বড় আনন্দ হইল! ধর্ম্মরাজ!—হইবারই কথা। কিন্তু নিয়তির গতি পরিবর্ত্তিত হয় না, এটা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি কহিলেন, "সাবিত্রি, বিপদে পড়িয়া অন্ধ হইও না। বাতুলতা পরিত্যাগ কর, গৃহে ফের। যমের অনুসরণ কেহ কখনো করে নাই, করিতে পারে নাই। কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ? স্বামীর নিকট তোমার যে ঋণ ছিল,

তাহা শোধ হইল। আর কেন? আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও না।"

সাবিত্রী কহিলেন, "প্রভু যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে ইহকালেই কি, পরকালেই কি, কখনই পত্নী, স্বামীর ঋণ হইতে মুক্ত হয় না। পত্নী চিরকালই পত্নী, স্বামী চিরকালই তাহার স্বামী।—পত্নী চিরকালই এই স্বামীর অনুগমন ও সেবা-শুশ্রূষা করিয়া চলিবে। ইহাই প্রকৃত সতী-ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারেই আজ আপনার অনুসরণ করিতেছি। তপস্যা, গুরুভক্তি, পাতিব্রত্য, ব্রত ও আপনার আশীর্ব্বাদেও কি আজ আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে না?"

সাবিত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া যম আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এমন ধর্ম্মকথা তিনি রমণীর মুখে আর কখনও শুনেন নাই। এখন শুনিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। তিনি সাবিত্রীকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। কহিলেন, "সাবিত্রি, তুমি অপূর্ব্বা সাধ্বী, তোমার কথা শুনিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমার আর যাহা বাঞ্ছা বল—আমি পূরণ করিব।"

যমরাজের কথা শুনিয়া সাবিত্রী বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম্মরাজ এত সহজে সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন যমরাজকে হঠাৎ প্রসন্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আশার একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যমরাজ প্রথমেই তাহাকে সত্যবানের জীবন যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন--ইহা বড় পরিতাপ! হায়! যমরাজ কি কিছুতেই এ অমূল্য নিধি সাবিত্রীকে ভিক্ষা দান করিবেন না? তবে আর সাবিত্রীর অন্য প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? সাবিত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাহার একটা কথা মনে পড়িল। সাবিত্রী ভাবিলেন," ভাল, আমার যেন বরে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ইহাতে উপকার হইতে পারে। আমার শ্বশুর অন্ধ, তাঁহার চক্ষু দু'টি ফিরিয়া আসিলে বড় ভাল হয়। আমি সেই বর চাই।"

সাবিত্রী এই ভাবিয়া যমরাজের কাছে বৃদ্ধ শ্বশুরের চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ সন্তুষ্ট চিত্তে সাবিত্রীকে সেই বর দিয়া আবার যমপুরীর পথে ধাবিত হইলেন।

কিন্তু কতদূর যাইয়া আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, তখনও পিছনে সাবিত্রী! দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলেন।

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্যা মানবী সাবিত্রী সেইখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যমরাজ ভাবিতে লাগিলেন, আমি তো এরূপ কখনও দেখি নাই। আজ একি হইল! যমরাজ সাবিত্রীর দিকে আর একবার ভাল করিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, সেই অপূর্ব্বতেজোরাশিমণ্ডিতা ক্ষুদ্রা বামাকৃতি! যমরাজ ভাবিলেন, এ তেজ এ কোথায় পাইল? এ শক্তি এ কোথা হইতে আনিল? কে বালিকাকে এমন শক্তিশালিনী করিল? পতিভক্তি,—তাই কি? কিন্তু তাই বলিয়া নিয়তির গতি কে কবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছে? এ বালিকা নিয়তিভঙ্গের মানসে কালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে—এ কিরূপে সম্ভব হইল?

যম আবার সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাবিত্রি, তুমি আমাকেও স্বচ্ছন্দে অনুসরণ করিয়া আসিতেছ—তুমি সামান্যা নও। কিন্তু কালের অনুসরণ করিতে নিশ্চয়ই তোমাকে বড় বেগ পাইতে হইতেছে; অবশ্যই তুমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ; কেন বৃথা অসম্ভব সাধনে যত্ন করিতেছ? এখনও গৃহে ফের।"

কিন্তু সাবিত্রীকে স্বামীর নিকট হইতে দূর করা ধর্ম্মরাজেরও সাধ্য নহে। সাবিত্রী উত্তর করিলেন,—"প্রভু, আপনি ধর্ম্মরাজ ;—ধর্ম্মরাজ হইয়া আপনি আমাকে অমন আদেশ করিবেন না। পতিই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্ম হইতে আপনি আমাকে বিচ্যুত করিবেন না। যেখানে পতি যাইবেন, স্ত্রীও সেইখানে যাইবে। তা না হইলেই বরং পত্নীর ধর্ম্মনষ্ট হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ হইয়া কি প্রকারে আমাকে সে পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন? পতি-সহগমন করিতে আমার এতটুকুও কষ্ট হইতেছে না। আপনি সে জন্য চিন্তিত হইবেন না।"

এই বলিয়া সাবিত্রী আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যমরাজ উৎকণ্ঠিত হইয়া আবার কহিলেন, "সাবিত্রি, তুমি অপূর্ব্বা সাধ্বী, কিন্তু তাই বলিয়া নিয়তির গতি পরিবর্ত্তিত করিতে যত্নবতী হইও না। ইহলোকে ও পরলোকে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, মানুষ কখনও মৃতের অনুসরণ করিতে পারে না। কেন বৃথা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছ? আমি এখনই তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়া যাইব। তখন বল দেখি, কি বিপদেই পড়িবে! একবার ভাবিয়া দেখ! এখনও গৃহে ফের।"

সাবিত্রী কাতর ভাবে পুনঃ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, একি আজ্ঞা করিতেছেন? অপরে যাহা বলে বলুক, কিন্তু আপনি ধর্ম্মের অবতার! আপনি কিরূপে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিবেন? ধর্ম্মে আছে, সাত পা একজনের সঙ্গে একত্রে হাঁটিলে বন্ধুতা করা হয়। ধর্ম্মরাজ, শাস্ত্রমতে আপনি এখন আমার সঙ্গে সেই বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ! সে সূত্র ছিন্ন করিয়া আপনি এখন আমায় কিরূপে ফেলিয়া যাইবেন?"

সাবিত্রী এই কথা কহিলেন, ধর্ম্মরাজের মনে হইল, কে যেন একখানি লৌহশৃঙ্খল আনিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে পরাইয়া দিল। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। বাস্তবিক তো—সাবিত্রীকে ফেলিয়া তিনি কিরূপে যাইবেন? সাবিত্রী তো ন্যায্য কথাই কহিতেছেন—তবে আর এখন তাহাকে নিরস্ত করিবার উপায় কি? সাবিত্রীকে নিরস্ত করা, সে তো এখন অধর্ম্ম! যম স্বয়ং ধর্ম্মরাজ হইয়া সে অধর্ম্ম কিরূপে করিবেন? আবার তাহা না করিলেই বা চলে কৈ? জীবই বা কি করিয়া মৃতের পুরীতে প্রবিষ্ট হইবে? তা'ও তো বিধিলিপির বাহিরে!

যম ব্যতিব্যস্ত হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া

কহিলেন, "সাবিত্রি, তোমার কথাগুলি অমৃত সমান; যত শুনিতেছি, ততই শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করা আমারও সাধ্য নহে। তুমি অন্য যাহা চাহ প্রার্থনা কর। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমার আর কি চাহিবার আছে, বল। আমি তোমাকে আরও এক বর দিব।"

দেবতার দান অগ্রাহ্য করিতে নাই। সাবিত্রী আরও এক বর প্রার্থনা করিলেন। সাবিত্রী এই বরে শ্বশুরের রাজ্য ভিক্ষা করিলেন।

"তোমার শ্বশুর অবিলম্বে নষ্টরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন"—এই বলিয়া যম আবার যমালয়ের পথ ধরিলেন।

কিন্তু কি বিড়ম্বনা!—একটু যাইতেই আবার বাধা পড়িল। আরও কতক দূর যাইয়া যম আবার ফিরিয়া দেখেন, তখনও পিছনে সাবিত্রী!

যম এবার বিচলিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সাবিত্রী শীঘ্রই চলৎশক্তিরহিত হইবে, শীঘ্রই তাহার গতি রুদ্ধ হইবে; কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। যমরাজ হাওয়ার বেগে অদৃশ্য পথে যমপুরীর পানে ছুটিয়া যাইতেছেন, আর সাবিত্রী তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে অনুসরণ করিয়া

আসিতেছে! একি ব্যাপার? যমরাজ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কহিলেন, "সাবিত্রি, আবার কেন? কোথায় আসিয়াছ, বুঝিতে পারিতেছ না। শীঘ্র ঘরে ফের। আমি অদৃশ্য হইলে তুমি যে আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ফিরিবার পথ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইবে না। বল, আরও কি চাই! আমি তোমায় আরও এক বর দিতে প্রস্তুত! সত্যবানের জীবন ভিন্ন আরও এক বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী এইবার পিতৃকুলের দিকে দৃষ্টি করিলেন। সুশীলা সাবিত্রী আপনার সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়াও প্রথমেই শ্বশুর-কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবতী হইয়াছিলেন, এইবার পিতামাতার দুঃখ নিবারণের জন্য বর গ্রহণ করিলেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি পুত্রহীন। তাঁহার বড় কষ্ট! রাজ্যটা ছারখারে যাইতেছে, বংশটা নির্ম্মূল হইতেছে। সাবিত্রী প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন এবারে আমার পিতা মাতা শত পুত্রের অধিকারী হ'ন। তাঁহাদের এক এক পুত্রের তেজে যেন চারিদিক্ আলোকিত হইয়া উঠে।"

যমরাজ সাবিত্রীকে এই বর দিয়া আবার যমপুরীর

দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এবারও বাধা পড়িল! যমরাজ সভয়ে দেখিলেন, তখনও পশ্চাতে সাবিত্রী আসিতেছে। এইবার যমরাজের মুখ শুকাইল। তিনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সাবিত্রী সম্মুখে আসিলে আবার কহিলেন—

"সাবিত্রি, তোমায় এক বর, দুই বর, তিন বর দিলাম, তবু তুমি আমার পশ্চাৎ ছাড়িতেছ না—একি ব্যাপার? তোমার আবার কি চাই? কেন বৃথা এত পরিশ্রম করিতেছ? আমি যে আর থাকিতে পারিতেছি না, সাবিত্রি! তুমি বিদায় না দিলে এবার যে আমাকে তোমায় ফেলিয়াই যাইতে হইবে। তখন কি বিপদেই পড়িবে, ভাবিয়া দেখ।"

কিন্তু সাবিত্রী তথাপি অচঞ্চল। একটুকুও বিচলিত হইলেন না। কহিলেন ;—

"ধর্ম্মাবতার, যদি ফিরিয়াছেন, তবে দাসীর আরও একটা কথা শুনুন। দেখুন, আমি ক্ষুদ্রা নারী, কিন্তু নারী হইলেও আপনার বন্ধু। সাতটী পা এক সঙ্গে চলিলে যেমন বন্ধুতা হয়, সাতটী কথা এক সঙ্গে বলিলেও তেমনই বন্ধুতা জন্মে। আপনি এখন উভয়তঃই আমার সহিত সেই সম্বন্ধে আবদ্ধ। আমায় পরিশ্রমের

কথা কহিয়া এমন সংসর্গ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। শাস্ত্রমতে সৎসংসর্গই লোকের প্রার্থনীয়। আমি এখন সেই সৎসংসর্গেই বাস করিতেছি। স্বামীর মত পবিত্র জিনিস, আপনার মত দুর্ল্লভ সামগ্রী এবং এই রম্য স্থানের মত পুণ্যময় প্রদেশ—এ সবের তুলনা কৈ? এমন সৎসংসর্গ আর কোথায় আছে? এইরূপ সংসর্গে থাকিয়া পথের কষ্ট আমার এতটুকুও বোধ হইতেছে না; দূরত্বও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বরং আরও অগ্রসর হইতে উৎসাহ হইতেছে। মন যেন আরও দূরদেশে ছুটিয়া যাইবার জন্য উন্মত্ত হইতেছে। আপনি স্বামীর সঙ্গে আমায়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক লইয়া যাউন। স্বামীর সঙ্গে থাকিলে দূর—দূর—অতি দূর প্রদেশেও আমার নিকটে দূর বলিয়া মনে হইবে না। আপনি আমার এই বন্ধুর কার্য্যটুকু করুন।”

যমরাজ বিষম বিভ্রাটে ঠেকিলেন। সাবিত্রী একি আবদার করিতেছে? বালিকাকে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বিধি-লিপি কিরূপে অগ্রাহ্য করেন? সে যে অসম্ভব! অথচ সাবিত্রী ধর্ম্মের বন্ধনে ক্রমেই তাঁহাকে গতিশূন্য করিতেছে। আজ না জানি কি বিভ্রাটই ঘটিবে!

যমরাজ মুহূর্ত্তেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "সাবিত্রি, যাহা অসাধ্য তাহা চাহিও না। বরং আরও এক বর প্রার্থনা কর। তুমি অপূর্ব্বা সাধ্বী, তোমার তত্ত্বজ্ঞানে আমি মোহিত হইয়াছি। বল, সত্যবানের জীবন ছাড়া আরও কি চাই। এইবার এই বর লইয়া আমায় মুক্তি দাও।"

সাবিত্রী দেখিলেন, যমরাজ তাহাকে বরের উপর বর দিয়া কেবলই পলাইবার সুবিধা খুঁজিতেছেন। সতী-সাধ্বী এবার এক অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন—এক অতি কূট ভিক্ষা করিলেন কহিলেন,—

"দেব, শাস্ত্রে বলে, সন্তান বিহনে লোকের গতি নাই। সন্তান না থাকিলে পরকালেরও কাজ হয় না। বিশেষ আমার শ্বশুরের রাজ্যরক্ষার্থে আমার স্বামীর সন্তানের একান্ত প্রয়োজন। এই বরে আমাকে স্বামীর ঔরসজাত শত পুত্রের অধিকারিণী করুন। আমার শ্বশুরের বংশও সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী হউক।"

যম কহিলেন, "সাবিত্রি, এই বরে তোমার প্রার্থিত শত পুত্রের ব্যবস্থা করিলাম। এই শত পুত্র তোমার পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্বতেজোবীর্য্যসম্পন্ন হইবে।

তাহাদের যশে চারিদিক ব্যাপ্ত হইবে,—তোমাদের কুলও ধন্য হইবে।—এইবার আমায় মুক্তি দাও।"

এই কহিয়া যম সাবিত্রীকে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয়ের অবসর মাত্র না দিয়াই আবার দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও আবার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

যম এবার বড় দ্রুত চলিলেন। ইচ্ছা সাবিত্রীকে কোনও রূপে পথের মাঝ খানে কোথায়ও ফেলিয়া রাখিয়া যান। মনে বড় চিন্তা, আজ না জানি কি প্রমাদই ঘটিবে। যমরাজ যত কৌশলে ও দ্রুত গতিতে পারেন, চলিতে লাগিলেন। ক্রমে পুরীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আবার একবার ফিরিয়া চাহিলেন। অভিপ্রায় দেখেন, সাবিত্রী সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে কি না। কি দেখিতে পাইলেন? দেখিলেন, অদ্ভুত! সেখানেও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সাবিত্রী! তেমনি স্থির, তেমনি ধীর,—তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন, আর না—এইখানেই শেষ! এই বার বিধিলিপি আর টেকে না। হয়, সত্যবান্ হাত ছাড়া হয়, নয়তো জীব সশরীরে মৃতের পুরী প্রবেশ

করিয়া এইবার সনাতন প্রথার উলট পালট করিয়া দেয়! যমরাজ এখন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন, কোন্ দিক্ রাখিয়া কোন্ দিক্ ছাড়িবেন, ঠিক ভাবিয়া পাইলেন না! ব্যতিব্যস্ত, ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক যম কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"সাবিত্রি, সাবিত্রি, একি করিতেছ মা? এ কোথায় আসিয়াছ মা? কি ভয়ঙ্কর স্থানেই প্রবেশ করিয়াছ! মা, আর অগ্রসর হইও না। এই খানেই সব শেষ! এই-ই জীবের শেষ সীমা! এ নদী উত্তীর্ণ হইও না; এ সীমা লঙ্ঘন করিও না; বিধাতার মর্য্যাদা রক্ষা কর; ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মময়ি, আত্ম-বিসর্জ্জন দাও।"

সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম যে বিসর্জ্জন করিতে পারি না, প্রভো! প্রভু, সতী-ধর্ম্মের উপরে ধর্ম্ম নাই, সতী-ধর্ম্মের উপরে রক্ষণীয় জিনিস নাই। কিন্তু সেই সতী-ধর্ম্মই এক্ষণে আপনার বিধানে গৌরবহীন হইতেছে। আপনিই বরপ্রদান করিয়া আমাকে স্বামীর ঔরসজাত শতপুত্রের অধিকারিণী করিয়াছেন, কিন্তু আপনিই আবার আমার সেই স্বামীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছেন! আমার স্বামীকে

লইয়া গেলে, আপনার সেই কথা কিরূপে সফল হইবে, প্রভো! আর আপনার কথা সফল হইলেই বা আমার গৌরব কিসে রক্ষা হয়, ধর্ম্মরাজ?"

যমরাজ ভীত! স্তব্ধ! চমকিত! তাইতো, মুহূর্ত্তে তাঁহার এ কি হইল? কোথায় সেই প্রজ্ঞা চক্ষু! কোথায় সেই দিব্যজ্ঞান! কোথায় সেই অপূর্ব্ব দৈবদৃষ্টি! এক মুহূর্ত্তে ধর্ম্মরাজ যেন আপনাকে এক মোহের জালে জড়িত দেখিলেন। সেই বিশাল বজ্রকঠিন, মায়াবন্ধ বৈতরণী-পরিখাতটে আসিয়াও ধর্ম্মরাজ যেন আর পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তিনি আবার একবার সাবিত্রীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। কি মহিমান্বিত-বালিকা! কি তেজোময়ী মূর্ত্তি! মানুষে কি এত তেজ হয়? জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল, জলধির মত জ্ঞানোচ্ছ্বাস-সম্পন্ন, হিমাচলের মত স্থির, শরতের আকাশের মত নির্ম্মল—কলঙ্কশূন্য! আপন জ্যোতিতে আপনি উদ্ভাসিত, আপন গৌরবে আপনি নত, ধর্ম্মবলে বিশ্ববিজয়িনী!—কে এই নারীরূপিণী? ধর্ম্মরাজকে কে আজ এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন?

ধর্ম্মরাজ বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, একি বলিতেছ

মা? এ যে নিয়তির গতি! নিয়তির গতি কে কবে রোধ করিয়াছে মা?"

সাবিত্রী সেইরূপই স্থির গম্ভীর ভাবে কহিলেন—

"কে না করিয়াছে, ধর্ম্মরাজ? কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের সৃষ্টি, কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের বিনাশ; এই কর্ম্মফললব্ধ অদৃষ্টই নিয়তি। লোকে নিজ নিজ কর্ম্মফলে এই নিয়তি গড়িতেছে, আবার নিজ নিজ কর্ম্মফলেই এই নিয়তিকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে; ইহাই জগতের নিয়ম—ইহাই সৃষ্টি-রহস্য। ধর্ম্মরাজ, মোহাবিষ্ট হইয়া আজ আপনি এই সৃষ্টি-রহস্য বিস্মৃত হইবেন না। দেখুন, কর্ম্মফলেই আমার পিতা-মাতা এ যাবৎ পুত্রহীন ছিলেন, আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই কর্ম্মফলেই আবার তাঁহাদের অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আপনিই আজ বর দিয়া তাঁহাদিগকে সেই অদৃষ্ট হইতে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু তবু দেখুন, আপনি আজ স্বইচ্ছায়ই তাঁহাদিগকে এই মুক্তি দেন নাই। তাঁহাদের কর্ম্মফলই আপনাকে বাধ্য করিয়া মুক্তি দেওয়াইতেছে। জগৎ এইরূপেই চলিতেছে! আমারও অদৃষ্ট এইরূপেই পরিবর্ত্তিত হইবে, ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মফলেই সত্যবান্ আজ আপনার করায়ত্ত,

কর্ম্মফলেই আজ আমি পতিধনে বঞ্চিত। কিন্তু এই কর্ম্মফলেই আবার আমি এই ধনের অধিকারী হইব, জানিবেন। আমার কঠোর সাধনাই আবার আপনাকে আমার প্রতি প্রসন্ন করিবে—আবার আমায় পতিপুত্র-বতী করিবে। ধর্ম্মরাজ বলুন, অভাগিনীর কর্ম্মফল নাশের আরও কত বাকী। যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে দাসীকে দয়া করিয়া আবার তাহার স্বামী ফিরাইয়া দিন। আর যদি তাহা না হয়, বেশ, অগ্রসর হউন, আপনার অপূর্ব্ব পুরীর অপূর্ব্ব আসনের নীচে বসিয়া দাসী আরও অনন্ত কাল সাধনা করিবে। স্বামিহীনা হইয়া আর সে ইহজীবনে ঘরে ফিরিবে না।"

সাবিত্রী চুপ করিলেন। যম কহিলেন, "আবশ্যক নাই মা। কোনও অজ্ঞানতার বিষম অন্ধকারে, ধর্ম্মরাজ বলিয়া নিজকে স্ফীত করিয়া এতদিন এক মোহের রাজ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম। জানি না, কোন্ কৃপাময়ী আজ তুমি আমাকে চির-জীবনব্যাপী সে মোহের স্বপন হইতে জাগ্রত করিয়া দিলে! মা, এই লও তোমার স্বামীর জীবন, আর এই লও সেই সঙ্গে আমার চির-মঙ্গলাশীর্ব্বাদ। আমার বরে আমার আশীর্ব্বাদে পূর্ণ চারি শত বৎসর এই জরারোগপীড়িত মর্ত্ত্য ধামে

সুখের রাজ্য স্থাপন করিয়া আবার মা তোমরা অপূর্ব্ব শান্তি লাভ কর। তোমাদের আদর্শে, তোমাদের পবিত্রতায়, তোমাদের শিক্ষায় জগতের লোক দেবভাবে অনুপ্রাণিত হউক।"

এই বলিয়া যম সেই পাশাবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহটী সাবিত্রীকে আবার বাহির করিয়া দিলেন। অপরূপ প্রতিভামণ্ডিতা বিশ্ববিজয়িনী শক্তিমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাবিত্রী আবার মুহূর্ত্তে এক লজ্জাবিনয়-মণ্ডিতা কমনীয়া রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মেঘমুক্ত আকাশের ঈষৎ রৌদ্রমণ্ডিত লোহিত রাগের মত এক অপূর্ব্ব প্রফুল্লতার ভাব আসিয়া এক মুহূর্ত্তে সাবিত্রীর উদ্বেগমলিন নয়ন-কোণে, গণ্ডে ও কপোলদেশে ছড়াইয়া পড়িল। সাবিত্রী জানু পাতিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট উপবিষ্টা হইয়া যুক্তকরপুটে সে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ, সে দুর্ল্লভ ও উত্তম পুরুষ মাগিয়া লইলেন। সেই মুহূর্ত্তে জগতের এক সহস্র সহস্র ও কোটী কোটী বৎসরের প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! যাহা এ পর্য্যন্ত কেউ কখনো করে নাই, যাহা আর কেউ কখনও করিতে পারিবে কি না জানি না, সেই অদ্ভুত কাণ্ড সতীত্বের মহিমায় জগতে এই একবার মাত্র সংঘটিত হইল! জগতের লোকে

সাবিত্রীর বর-গ্রহণ।

বুঝিল, দেবতারাও বুঝিলেন, সতীত্বের অধিক ধর্ম্ম নাই, সতীর উপরে শক্তিশালিনী নাই, সতীত্বের মত আর কিছু পবিত্র নাই! এই সতীত্বের তেজে একবার দক্ষালয়ে প্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, আবার এই আর এক-বার বিশ্বের প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল;—ধর্ম্মরাজেরও এক নূতন শিক্ষা হইল! জগতের সকল শক্তির উপরে সেই মুহূর্ত্তে সতী-ধর্ম্মের এক উজ্জ্বল আসন স্থাপিত হইল।

সাবিত্রীকে সত্যবানের জীবন অর্পণ করিয়া যমরাজ চলিয়া গেলে, সাবিত্রী আবার সত্যবানের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের কি সম্বন্ধ সাবিত্রী তো তাহা জানে না। সাবিত্রী তো দুইদণ্ডের মধ্যেই যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোন্ দূর-দুরান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন—বুঝি পৃথিবীর সীমাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার যেন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

সাবিত্রী যাইবার সময় যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়াছিলেন। যমকে অনুসরণ করিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে করিতে সেই দূর দেশে পথ চিনিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময়ে যে কিরূপে ফিরিলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। ধর্ম্মরাজ প্রস্থান করিলে সাবিত্রী

এক মুহূর্ত্ত সর্ব্বজ্ঞানরহিত হইয়া রহিলেন। সেই এক মুহূর্ত্তে যেন সাবিত্রী কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি সকলই যেন হারাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল! আবার সাবিত্রী নিজকে বুঝিতে পারিলেন, বাহ্যিক প্রকৃতি অনুভব করিলেন, দেখিতে পাইলেন, শুনিতে পাইলেন, স্পর্শানুভব করিলেন। সেই নব জীবন লাভ করিয়া সাবিত্রী যেন আবার দেখিলেন, আবার তিনি সেই নিবিড় কাননে স্বামীর দেহ কোলে করিয়া তেমনি ভাবে উপবিষ্ট। মুক্তগগনপটে, দূরে, অতি দূরে নক্ষত্রদলের আড়ালে তখনও যেন একখানি অস্পষ্ট আলেখ্য ক্রমে আকাশের গায় বিলীন হইয়া যাইতেছিল! সাবিত্রী চাহিতে চাহিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

৪

সাবিত্রী যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার সত্যবানের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তখন সত্যবানের নিশ্বাসপ্রশ্বাস পুনঃ বহিতেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু একটু কম্পিত হইতেছে, রক্ত সঞ্চালন পুনরায় অনুভূত হইতেছে, সাবিত্রীর বোধ হইল, যেন তিনি তখনও ঘুমাইতেছেন। আনন্দবেগ কষ্টে সংযত করিয়া সাবিত্রী আবেগপূর্ণকণ্ঠে ডাকিলেন, "প্রিয়তম ! প্রিয়তম !"

সত্যবান্ ক্ষণিক মোড়ামোড়ির পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া হঠাৎ উঠিতে গেলেন, পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। সত্যবান্ আবার চেষ্টা করিলেন। এইবার মৃত্তিকায় হস্ত দ্বারা ভর দিয়া

আশ্চর্য্যভাবে সাবিত্রীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। যেন কোন গভীর স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়াছেন, এখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন, কি জাগিয়া আছেন, ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না।

কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সত্যবান্ কথা কহিলেন। আশ্চর্য্যভাবে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সাবিত্রি, আমরা এখানে কেন?" সাবিত্রী কহিলেন, "প্রিয়তম, আমরা যে কাঠ কাটিতে আসিয়াছিলাম, আর তো ফিরি নাই! কাঠ কাটিতে কাটিতে তোমার শিরঃ-পীড়া হইল, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলে, তার পর আঁধার হইয়া ক্রমে রজনী গভীরা হইল! সেই অবধি আমি তোমাকে লইয়া এইখানেই বসিয়া আছি। এখন কেমন বোধ করিতেছ?"

সত্যবান্ কহিলেন, "হুঁ, মনে হইতেছে। আমি বড় সাংঘাতিক ঘুমই ঘুমাইয়াছি! এমন গাঢ় ঘুম আমি যেন আর কখনও ঘুমাই নাই। এখনও আমার শরীর অবশ বোধ হইতেছে। আমি যেন কি এক বিকট স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। শ্যামবর্ণ এক দীর্ঘ পুরুষ, শরীরে তাঁ'র অপূর্ব্ব দীপ্তি, পরিধানে তাঁ'র রক্তবস্ত্র, মস্তকে তাঁ'র উজ্জ্বল মুকুট,—তিনি যেন আমায় টানিতে টানিতে

কোথায় লইয়া যাইতেছিলেন; আর তুমি যেন সাবিত্রি, তাঁ'র পশ্চাতে পশ্চাতে হাত যোড় করিয়া যাইতেছিলে! সাবিত্রি, একি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম?" সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "প্রিয়তম, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আর ভাবিয়া ফল কি? যাহা করিতে হইবে এখন সেই কথা ভাব। দেখ রাত্রি গভীরা হইয়াছে, চারিদিকে অন্ধকারে দৃষ্টিরুদ্ধ হইতেছে, পথের চিহ্নও কোথাও কিছু দেখা যাইতেছে না, পিতা-মাতা হয়ত আমাদের চিন্তায় একান্ত অস্থির হইয়াছেন। এখন কি করিবে?"

সত্যবান্ কহিলেন, "সত্য। আমি তো এ সব কথা এতক্ষণ ভাবি নাই! এখন কি করিব? চল আমরা ত্বরায় আশ্রমের দিকে গমন করি। পিতা মাতার জন্য আমার মন চঞ্চল হইতেছে।"

এই বলিয়া সত্যবান্ উঠিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উঠিয়া ভালরূপ দাঁড়াইতে পারিলেন না। সাবিত্রীকে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার শরীরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রী কহিলেন, "তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল। আমার আশঙ্কা হইতেছে, পথ চলিতে পারিবে না—কষ্ট হইবে। যদি

অনুমতি কর, তবে না হয় আজ এইখানেই থাকি। কাল প্রভাত হইলে তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইব।"

সত্যবান্ কহিলেন, "না, সাবিত্রি, না। পিতা-মাতা আমাকে না দেখিলে মুহূর্ত্তে অস্থির হন, একদিন অসময়ে আশ্রমের বাহির হইলে ভাবিয়া আকুল হন, সন্ধ্যার পরে আমায় প্রায় বাহির হইতে দেন না, আজ এত রাত্রি বাহিরে রহিয়াছি, না জানি তাঁহারা কি চিন্তাই করিতেছেন। আমার চিন্তায় তাঁহারা না জানি কত কষ্টই পাইতেছেন। সাবিত্রি, চল যত শীঘ্র পারি আশ্রমে যাই।"

সাবিত্রী সত্যবানকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কহিলেন, "আমি কখনও জানিয়া শুনিয়া অধর্ম্ম করি নাই; কখনও তোমার মুখ ছাড়া অন্য কিছু ভাবি নাই, তুমি এত চিন্তিত হইতেছ কেন? আমার দান-ধর্ম্ম ও যাগ-যজ্ঞাদির ফলে অদ্য রাত্রি আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষে শুভ হউক। অনুমতি কর, আজ এইখানে থাকি। কাল তোমার শরীর সুস্থ হইলে, তাঁহাদিগকে যাইয়া সকল কথা কহিব।"

কিন্তু সাবিত্রীর কথায় পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত বালকের উদ্বেগ দূর হইল না। সত্যবান্ একান্ত ব্যাকুল হইলেন।

পুনর্জীবন-লাভের প্রত্যাগমন ।

তিনি কহিলেন, "সাবিত্রি, আমার পিতা-মাতা আমাকে না দেখিলে বাঁচিবেন না, তাঁহারা না বাঁচিলে নিশ্চয় জানিও, আমিও প্রাণ রাখিব না। এখন আমার ভাল-মন্দে যদি তোমার দৃষ্টি থাকে, আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে মুহূর্ত্তমাত্রও আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় আশ্রমে চল। আমি আর এক মুহূর্ত্ত এইখানে থাকিতে পারিব না।"

সত্যবানের এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী আর বাক্য ব্যয় করিলেন না। সত্যবান্ তাহাকে কষ্টের কারণ ভাবিতেছেন—সাবিত্রীর ইহা ভাবিতেও বড় কষ্ট হইল। সতীর সতীত্বাভিমানে এই কথায় একটু আঘাত লাগিল। সাবিত্রী তখনই কাপড় গুছাইয়া, চুল বাঁধিয়া, শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে আশ্রয় দিয়া লইয়া চলিলেন। একে কোমলা নারী, তা'তে আবার তিন-দিনের এই উপবাস, সেই উপবাসের উপর এই মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম! কি সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু তবুও সাবিত্রী প্রাণ দিয়া সত্যবানকে বহিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর কুঠার তাহার হস্তে স্থান পাইল, তাঁহার ফলের তোড়া ও কিছু জ্বালানি কাষ্ঠও সাবিত্রী সঙ্গে করিয়া লইলেন। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে

সাবিত্রী বিশ্বভারবাহিনী মূর্ত্তিমতী শক্তির মত সেই আঁধার পথ আলো করিয়া যাইতে লাগিলেন। সত্যবান্ তাহার কাঁধে ভর দিতে দিতে চলিলেন।

উপসংহার

ইহার পরে আর আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। অন্ধমুনি ও অন্ধমুনি-পত্নী আকুল হইয়া সাবিত্রী ও সত্যবানকে খুঁজিতেছিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, বনের অন্যান্য মুনি ও মুনিপত্নীগণও তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন;

এবং নানা প্রবোধ বচনে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময় ঊষার নবীন রাগের সহিত সাবিত্রী ও সত্যবান্ নয়নরঞ্জন নবোদিত রবির মত যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে পাইয়া আশীর্ব্বাদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ পূর্ব্বক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অন্ধমুনি যমের বরে পূর্ব্বেই চক্ষু পাইয়াছিলেন, এইবার পুত্র ও পুত্র-বধূকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিলেন। আহা! কতদিন তিনি প্রাণাধিক পুত্রের শান্তোজ্জ্বল মুখখানি দেখেন নাই। এইবার তাঁহার আর সুখের সীমা রহিল না।

পরদিন শালদেশ হইতে অপূর্ব্ব শুভসংবাদ লইয়া দূত আসিল। সে সংবাদ বড় শুভ—বড় আশ্চর্য্য! দ্যুমৎসেনের শত্রু পরাজিত হইয়াছে। শত্রুকে পরাজিত করিয়া সেনাপতি রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। এখন দ্যুমৎসেনকে যাইয়া আবার রাজ্য করিতে হইবে। দাউ দাউ করিয়া জ্বলন্ত পাবকের মত সেই আনন্দ-খবর বনময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বনবাসী তপস্বিগণ মহানন্দে বৃদ্ধ রাজা ও বৃদ্ধা মহিষীকে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রাজ-বেশে ভূষিত করিলেন।

সুখের ঢেউ একেলা আসেনা। সেই দিন মদ্রদেশ হইতে অশ্বপতিও কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। অশ্বপতি বিধিলিপির কথা জানিতেন। তাই দেখিতে আসিলেন, কন্যার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে। তিনি আসিয়া কন্যাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবিত্রী এ পর্য্যন্ত সে অদ্ভুত কাহিনী কাহারও নিকটে ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু পিতার নিকটে গোপন করিতে পারিলেন না। সকল খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ী এই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গুণবতী বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সত্যবান্ সেই কথা শুনিয়া আপনাকে অপূর্ব্ব ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিলেন। মুনি-ঋষিরাও চারিদিক হইতে আসিয়া এই অপূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া সাবিত্রীকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেশ-বিদেশে সাবিত্রীর নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

এখন এস পাঠক-পাঠিকা, গ্রন্থশেষে আমরা আজ একবার এই সাবিত্রীকে আমাদের মধ্যে আহ্বান করি!

যুদ্ধজয় করিয়া বীর আসে, আমরা তাঁহাকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করি; দেশ জয় করিয়া রাজা আসে,

আমরা তাঁহাকে বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া সম্মান করি; হিন্দুর ঘরে ঘরে দেবতা আসে, আমরা তাঁহাকে মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া অর্চ্চনা করি; সাবিত্রী আজ ধর্ম্মরাজকে জয় করিয়া আমাদের নিকট আসিতেছেন, তাঁহাকে আজ আমরা কি লইয়া সম্ভাষণ করিব? এস, সাবিত্রী যে শিক্ষা, যে দীক্ষা লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষাতেই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেই। তাঁহার আদর্শে, তাঁহার শিক্ষায়, আবার এই দুর্ভাগ্য ভারতে আমাদের প্রতিকুলনারীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

পরিশিষ্ট।

আমরা এতক্ষণ সাবিত্রী-কাহিনী বর্ণনা করিলাম, এইক্ষণ সাবিত্রী-চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়া এই গ্রন্থ শেষ করিব।

পুরাণে যত স্ত্রীলোকের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাবিত্রীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আদর্শ নারী বলিয়া পরিগণিতা। সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা, ইঁহারাও সতীত্বের হিসাবে সাবিত্রীর তুল্যা বটে, কিন্তু কোন কোন হিসাবে ইঁহারাও সাবিত্রীর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এইখানে পাঠক-পাঠিকাকে একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সকল নারী-চরিত্রগুলি চিত্রকরের তুলিকাস্পর্শে

কোথায় কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমরা সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বসি নাই। সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, ঐ সকল রমণী-চিত্র ছাড়িয়া চিত্রকরেরই দোষগুণ বিচার করিতে হয়! যদি এমত হইত যে, সকল চিত্রকরই আদর্শ চিত্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষমতানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন মাত্র, তাহা হইলে আমরা এই পথে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু চিত্রকরের উদ্দেশ্য কেবল আদর্শ চিত্র অঙ্কনই নহে। চিত্রকর যেমন আদর্শ চিত্র গড়েন, তেমনই আবার নানারূপ বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াও দেখান। কারণ বৈষম্য এবং বিভিন্নতা আদর্শের উপলব্ধিকল্পে অত্যাবশ্যকীয়। যে চিত্রকর এইটুকু না বোঝেন, যিনি এইটুকু না বুঝিয়া কেবল আদর্শ চিত্র গড়িতেই ব্যস্ত—তিনি কখনও সফলতা লাভ করিতে পারেন না। যেমন কেবল রসগোল্লা খাইলেই রসগোল্লার মধুরাস্বাদ বুঝা যায় না—একটু চাট্‌নিরও দরকার; যেমন কেবল জ্যোৎস্না রাত্রি দেখিলেই জ্যোৎস্নার মহিমা বুঝা যায় না—একটু অন্ধকারেরও আবশ্যক; যেমন কেবল সুখ ভোগ করিলেই সুখের মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় না—একটু

দুঃখেরও অবস্থিতি দরকার;—তেমনি কেবল আদর্শ চরিত্র গড়িলেই চিত্রকরের আদর্শের সৌন্দর্য্য বোঝা যায় না—তাঁহার চিত্রের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে অনাদর্শের চিত্রও অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইবে; নতুবা তাঁহার সফলতার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রাচীন কবিগণ এই জন্যই আদর্শের সহিত নানা অনাদর্শ চরিত্রও অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের চিত্রের দোষগুণ বিচার করিবার জন্য আমাদিগকে তত্তৎ কবিদের ক্ষমতার বিচার করিবার দরকার নাই। সেই সেই কবিরা সকলেই সিদ্ধহস্ত নিপুণ চিত্রকর ছিলেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র গড়িবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপ তুলিকা-সঞ্চালন করিয়াছেন মাত্র—চিত্রগুলির বিভিন্নতার এই মাত্র কারণ—অন্য কিছুই নহে। সুতরাং সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি চিত্রগুলি ঠিক আদর্শ চিত্র না হইলেও সম্পূর্ণ চিত্র, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ঐ সকল চিত্রের চিত্রকর একই ব্যক্তি হউন, বা বিভিন্ন ব্যক্তিই হউন, তিনি বা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই ঐ চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের কোন অংশ বা স্থল অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট নাই। কাজেই, সে গুলি যে

সকলই আদর্শ চিত্র এবং একমাত্র চিত্রকরের ক্ষমতানু-সারেই বিভিন্ন প্রকারে বিকশিত, তাহা আমরা মনে করি না। দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা—ইঁহারা প্রত্যেকেই কবির সম্পূর্ণ সৃষ্টি বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই ঠিক আদর্শ চরিত্র নহে—ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য; এবং যাঁহারা এই কয়টী চিত্র একটু মনোযোগের সহিত পড়িবেন, তাঁহারাই এ কথাটা বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই সম্পর্কে মাত্র দুই চারিটী বৃহৎ বৃহৎ কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

আমার এই কথাগুলি শুনিয়া পাঠক-পাঠিকারা একটু গোলযোগে পড়িতে পারেন। তাঁহারা হয়ত ভাবিতে পারেন আমি সাবিত্রী-চরিত্রের প্রাধান্য স্থাপিত করিতে যাইয়া, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। আমার মতে আদর্শ চরিত্র ও মহচ্চরিত্রে একটু প্রভেদ আছে। যিনি পৃথিবীতে সকলকেই সমান ভাবেন, নিজকে ও বিশ্বকে তুল্যরূপই দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি আদর্শ ও মহৎ দুই-ই। কিন্তু যিনি বিশ্বের চিন্তায়ই আকুল, নিজকে হয়ত বিশ্বের জন্য বিসর্জ্জিত করিতে উদ্যত, তিনি মহৎ,—ঠিক আদর্শ নহেন। মোট কথা,

যিনি আদর্শ তিনি মহৎ হইলেও যিনি মহৎ তিনি সর্ব্বদা আদর্শ নহেন। দাতাকর্ণ ব্রাহ্মণসেবার জন্য পুত্র হত্যা করিয়াছিলেন, তিনি প্রসিদ্ধ দাতা, এবং এই জন্য মহৎ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তিনি প্রকৃত আদর্শ-চরিত্র, এ কথা না-ও ধরা যাইতে পারে। কারণ একজনের ক্ষুধানিবৃত্তির (অথবা খেয়াল পরিতৃপ্তির) জন্য, কিম্বা নিজের ধর্ম্মাভিমান বজায় রাখিবার জন্য, তিনি একটী শিশুর জীবন গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই।—ইহা আদর্শ হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ সীতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী, প্রভৃতি সকলগুলিই মহচ্চরিত্র হইলেও ঠিক আদর্শ-চরিত্র নহে। এই কথাটী ভালরূপে বুঝিতে গেলে, প্রকৃত আদর্শ-চরিত্র কি তাহা পূর্ব্বে ভালরূপ জানা চাই। আমি প্রথমে সেই সম্বন্ধেই দু'একটী কথা কহিব।

আদর্শ কাহাকে বলে? যাহা হওয়া উচিত, যে রূপটী হইলে কোন দিকেই কোন অভাব, অভিযোগ কিম্বা ত্রুটী থাকে না, এবং যাহার উপরে উদ্দেশ্যসিদ্ধি-কল্পে আর কিছুই হইতে পারে না, তাহাই আদর্শ। আর যে চরিত্র এই আদর্শের সম্ভবানুরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী, সেইটীই প্রকৃত আদর্শ চরিত্র।

এখন নারীর আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাহাই বিবেচ্য। কোমলতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতা, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিজনবর্গের যথাসাধ্য যত্ন, গৃহরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, পতির সহিত এক হইবার জন্য আত্ম-খর্ব্বতা, আত্মীয়-স্বজনের সুখের জন্য কেবল [illegible]সর্জ্জন নয়—আত্মবজায় রাখিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম, সুখে-দুঃখে স্বামীর অনুরূপ হওয়া, ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য, কর্ত্তব্য করিবার জন্য, নির্ভীকতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আদর্শ নারীর সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন।—"অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারী-চরিত্রের প্রকর্ষের শেষ সীমা হইবে।" এই স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার সহিত কর্ত্তব্য-পরায়ণতাটী যোগ করিয়া দিলেই, আমার মতে আদর্শ নারীচরিত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা হইত। বাস্তবিক আদর্শ-চরিত্র গঠনে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা অত্যাবশ্যকীয়। মহচ্চরিত্রে ও আদর্শচরিত্রে এইটুকু তফাৎ যে, মহচ্চরিত্র অনেক সময়ে আপনার মহত্বের স্রোতে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন, কিন্তু আদর্শ-চরিত্র তাহা

হন না। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানটুকু সাবিত্রীর মধ্যে আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তেমন আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। এই জন্যই আমরা সাবিত্রী-চরিত্রকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিতে উদ্যত।

যাঁহারা সীতা, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, শকুন্তলা, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতির চরিত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক-মাত্র সাবিত্রী-চরিত্র ভিন্ন তাহাদের কোনটীতেই এই সকলগুলি গুণের একত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সীতা নম্রতা, কোমলতা, পতিপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার চূড়ান্ত আদর্শ; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রে ঠিক সকলগুলিরই বিকাশ নাই। সীতা, সাবিত্রীর মত কর্ম্মশীলা নহেন। পার্ব্বতী পতিকে মুগ্ধ করিবার জন্য মদন-ভস্মের কারণ হইয়াছিলেন। শকুন্তলা পিত্রনুমতি বিনাই দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি পতি-চিন্তায় বিশ্ব-চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি-সেবা পাইলেন না—কোপ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। শৈব্যা এত কষ্ট সহ্য করিয়া, এত করিয়াও শেষকালে একবারে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়া-

ছিলেন। দময়ন্তী ও চিন্তা উভয়েই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, কর্ম্ম-ক্ষমতা এবং স্নেহাতিশয্যে অনেকটা সাবিত্রীর সমকক্ষ হইলেও তাঁহার মত মনের বলে বলবতী নহেন। তাঁহারা কঠোর সাধনায় পতিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আনিতে পারেন নাই। কিন্তু সাবিত্রী-চরিত্রে আমরা এই সকল অসম্ভাব একটীও দেখিতে পাই না। তাঁহার চরিত্রে সকলগুলি সদ্‌গুণই পূর্ণমাত্রায় এবং যথা-পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। একটী আর একটীকে ছাপাইয়া উঠে নাই। একটী আর একটীকে অতিক্রম করিয়া তাহার কার্য্য নষ্ট করে নাই। শকুন্তলার মত তিনি স্নেহাধিক্যে জগৎ বিস্মৃত হন নাই। শৈব্যার মত তিনি দুঃখে পড়িয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে চাহেন নাই। পার্ব্বতীর মত তিনি স্বামীকে মুগ্ধ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন নাই। সীতার মত তিনি পঞ্চবটী বনে রামের চিন্তায় আকুল হইয়া ভালমন্দ বিস্মৃত হওয়তঃ লক্ষ্মণকে অযথা ভর্ৎসনা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সকলগুলি ধর্ম্মভাব পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, উহারা সকলেই সংযত কর্ত্তব্যবুদ্ধি-চালিত। এরূপ নারী-চরিত্র আর আমরা কুত্রাপি দেখিতে পাই না। সাবিত্রী-চরিত্রের নিম্ন-

লিখিত ঘটনাটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে এই কথাটা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সাবিত্রী পিতৃ-আজ্ঞায় বনভ্রমণ করিয়া সত্যবানকে পতি মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় নারদ আসিয়া কহিলেন, এই যুবক স্বল্পায়ু—এক বৎসর পরে ইহার দেহত্যাগ হইবে! অশ্বপতি সেই কথা শুনিয়া কন্যাকে অন্য পাত্র মনোনীত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কন্যা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! কন্যা যতদূর সম্ভব পিতৃপরায়ণা, গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী; কিন্তু হইলে কি হয়? কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাকে বলিতেছে, এই স্থলে পিতা ও গুরুজনের কথা রক্ষার উপরেও তাহার অধিকতর গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কন্যা সেই কথা না শুনিয়া পারিলেন না। যাঁহাকে কখনও অবহেলা করিতে পারেন নাই—এই বিষম কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কর্ত্তব্যচালিতা হইয়া সাবিত্রী তাঁহাকেও অমান্য করিলেন। জানেন, এই সত্যবানকে বিবাহ করিলে, এক বৎসর পরেই তাঁহাকে বৈধব্যদশা পরিগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী বিচলিত হইলেন না—কর্ত্তব্যের আদেশ মতই চলিতে লাগিলেন। এইটুকু করিতে তেমন সুশীলা বালিকার যে কতখানি কর্ত্তব্য-

বুদ্ধি এবং মানসিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা অনুমান করুন।

তারপর সাবিত্রী শ্বশুর-গৃহে আসিলেন। এইখানে সাবিত্রী যাহা করিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি রমণীগণ পতির বিপদে পতিকে অনুগমন করিয়া অনেক বিপদাপদই ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের এই পাতিব্রত্য পতির বিপদকালেই প্রকাশিত হইয়াছে—পতিকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে নিজকেও বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন; তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব করিবার জন্যই তাঁহাদের সঙ্গে এক হইয়াছেন। কিন্তু শুধু স্বামীর সঙ্গে এক হইবার জন্য তাঁহারা আত্ম-খর্ব্বতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আমরা ঐ সকল চিত্রে দেখিতে পাই না। সাবিত্রী-চরিত্রে আমরা সেইটুকু দেখিতে পাই। সাবিত্রী যদি সীতা, দময়ন্তী ও চিন্তা প্রভৃতির ন্যায় অবস্থায় পড়িতেন, তবে তিনিও যে নিশ্চিত তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তেমন অবস্থায় না পড়িয়াও শুধু স্বামীর সঙ্গে এক হইবার জন্য যে সাবিত্রীর বন্য বেশ—তাহা আমাদের চক্ষে বড় নূতন, বড় মনোরম। সাবিত্রী রাজনন্দিনী!

অশ্বপতি যাইবার কালে তাঁহাকে যথেষ্ট রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গেলেন। সাবিত্রী সে গুলি পরিয়া থাকিলে সত্যবানের কোনও ক্ষতি ছিল না, বরং তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী সেরূপ দেখিলেই তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী তাহা করিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন, তাই সীতা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন; বনে প্রভু নানা কষ্ট ভোগ করিলেন, তিনি নিকটে থাকিলে প্রাণ দিয়াও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিবেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পারিবেন, এই বলিয়াই সীতা বনগামিনী হইয়াছিলেন। দময়ন্তী পতিকে যথাসম্ভব বিপদাপদ হইতে নিজ-চেষ্টায় রক্ষা করিতে পারিবেন, এইজন্য বনে গিয়াছিলেন †। চিন্তারও মনের ভাব প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সাবিত্রীর বেশভূষা পরিত্যাগের উদ্দেশ্য ঠিক এই নহে। সাবিত্রীর উদ্দেশ্য

---

† দময়ন্তী পতিকে কহিতেছেন,—

হৃতরাজ্যং হৃতদ্রব্যং বিবস্ত্রং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতম্।
কথমুৎসৃজ্য গচ্ছেয়ং ত্বামহং নির্জ্জনে বনে ॥
শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য চিন্তয়ানস্য তৎসুখম্।
বনে ঘোরে মহারাজ নাশয়িষ্যাম্যহং ক্লমম্ ॥

স্বামীর সহিত এক হওয়া ; স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে অভিন্ন সম্বন্ধ, তাহা স্থাপিত করা ; স্বামীর সত্তায় নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া! এক দিকের আত্ম-বিসর্জ্জনের স্পৃহা উদ্রিক্ত হইতেছে, স্বামীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ; অপরদিকের আত্ম-বিসর্জ্জনের আগ্রহ প্রকাশিত হইতেছে, স্বামীর সহিত আপনাকে অভিন্ন করিবার জন্য। কোনটী শ্রেষ্ঠ ? আমি বলি শেষোক্তটীই শ্রেষ্ঠ! কেন না, শেষোক্তটীর মধ্যে প্রথমোক্তটী রহিয়াছে—কিন্তু প্রথমোক্তটীর মধ্যে শেষোক্তটী সম্পূর্ণভাবে নাই। এই-খানেই সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব।

তারপর সাবিত্রী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান বৈচিত্র্যের কথা! এইখানে সাবিত্রীর কাহারও সহিত তুলনা নাই। এইখানে সাবিত্রী আর্য্যনারী-সমাজে সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস। এইখানে সাবিত্রী শুধু পতিব্রতা, সতী এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণা নহেন। এইখানে সাবিত্রী কর্ম্মময়ী, সাধিকা; বীর্য্যবতী! বীরাঙ্গনাদের পূর্ণাদর্শ আমরা এই খানেই দেখিতে পাই। এই বীর্য্য, এই বল, সাবিত্রীর চরিত্রে, শারীরিক ও মানসিক এই উভয় প্রকারেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই দুই প্রকারেরই পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ এই মানসিক বলের পরিমাণ উপলব্ধি করুন।

সাবিত্রী জানেন, সত্যবান্ এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যগ করিবেন, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ খানেই শেষ নহে। সাবিত্রী বিবাহের পর এই নিয়তি ও অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত! সাধনায় কি অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হয় না? এমন কি কোন উপায় নাই, যাহাতে এই বিষম অবস্থার হস্ত হইতে পতিকে উদ্ধার করা যায়? সাবিত্রী সেরূপ কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহার একদিকে অতীতের কঠোর দৃষ্টান্ত, অপর দিকে লোকের কঠোর ভবিষ্যদ্‌বাণী। অতীত সাক্ষ্য দিতেছে, কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, কেহই মৃত্যুর আলয় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। লোকে বলিতেছে, অদৃষ্ট কখনও বিনষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হয় না, বিধাতার লিপি কখনও ফিরে না। সাবিত্রী তথাপি অদম্য সাহসে, অদম্য বীরত্বে এই অপরাজিত, এই অশ্রুত-পরাজিত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইলেন! সেই উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন। তারপর আরও বীরত্ব দেখ, সাবিত্রী যে কেবল সাধনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাশুশ্রূষা, পতির মনরঞ্জন, গৃহ-কার্য্য, দেবতার কার্য্য, এই সবও করিতে লাগিলেন। এমন কি সত্যবানের এই আশু পরিণামের কথা তিনি শ্বশুর-শাশুড়ী বা সখি-সঙ্গিনী কাহারও নিকটে প্রকাশ পর্য্যন্ত করিলেন না। এই-রূপ একটা গুরুতর ভার একা একা নিজের মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া এই ভাবে এমন একটা বৃহৎ সাবধান প্রবৃত্ত ও কৃতকার্য্য হওয়া কি প্রকার প্রবল সক্তির কার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়! তারপর সাবিত্রীর ত্রিরাত্রি-ব্যাপী কঠোর তপস্যা, তিন দিনের উপবাসের পর পতির সহিত সন্ধ্যাকালে বনপ্রবেশ, মনে আসন্নপ্রায় বিপদের গুরুতর চিন্তা রাখিয়াও মুখে প্রফুল্লভাবের অভিনয়, ঘোর অন্ধকারের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদাপদের মধ্যেও স্থির ধীরভাবে নিজের কঠোর সঙ্কল্প, কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং পবিত্রতা লইয়া দেবতারও অস্পৃশ্য হইয়া বসিয়া থাকা, এবং সর্ব্বোপরি যমের সঙ্গে সঙ্গে যমালয় পর্য্যন্ত যাইয়া শান্তশিষ্ট ভাবে যমকেও মুগ্ধ করিয়া পতিকে ফিরাইয়া আনা— এই সকল কতখানি কর্ত্তব্যবুদ্ধি, স্থির বিবেচনা পত্যানুরাগ, শারীরিক ও মানসিক কষ্টসহিষ্ণুতা এবং

সাধনার একত্র মিশ্রণে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে।

এই সকল গুণগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু একত্র সংমিশ্রণে একই সময়ে ইহাদের এই পরিমাণে থাকা নিতান্ত বিস্ময়কর! জল এবং অগ্নি বিভিন্নস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে, কিন্তু দুইটী মিশ্রিত করিয়া দাও, একটী তৎক্ষণাৎ লোপ প্রাইবে। এইরূপ বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন এবং বিদ্রোহ-গুণ-সম্পন্ন কতকগুলি জিনিস একত্র করিলে, নিশ্চয় একটী অপরটীর দ্বারা নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ও প্রশমিত হইবে। ইহা অনিবার্য্য। মানসিক বৃত্তিগুলির সম্পর্কেও এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে। বিপদের সময় কিম্বা কোন মানসিক উত্তেজনার সময় সম্যক্ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, বা স্থির বিবেচনা কোনও মানবের প্রায় থাকে না; কিন্তু সাবিত্রী-চরিত্রে আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। স্বামী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যম সম্মুখে, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী তৎকালেও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বা বিবেচনা পরিত্যাগ করেন নাই—কি অপূর্ব্বা নারী! কি অপূর্ব্ব বীরত্ব! কিন্তু এইবার এই বীরত্বের আরও একটা দিক দেখুন।

এই মানসিক শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তিরও কেমন বিকাশ হইতেছে, এইবার আমাদিগকে সেই দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। তিন দিনের উপবাস, তাহার পরে সন্ধ্যা সম্মুখীন করিয়া কাননে প্রবেশ, তাহার পর স্বামীকে আশ্রয় করিয়া উপবেশন, তারপর যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ এবং সর্ব্বশেষ এই মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তির পরই পতিকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতেও সকল বাধা-বিঘ্ন, বৃক্ষ-লতা ও উচ্চনীচ অসমতল ভূমির প্রতিবন্ধকাদি অগ্রাহ্যপূর্ব্বক ততদূরের পথও অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—ইহাদের আর তুলনা হইতে পারে কি?

এইখানে সাবিত্রীর তুলনা বাস্তবে কি কল্পনায় কোথাও নাই। ইহা অপেক্ষা নারীর চরিত্র আর উপরে উঠিতে পারে না।

আমরা এই জন্যই এই চরিত্রকে সকল নারীচরিত্র অপেক্ষা উত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শনারীচরিত্র বলিতে কুণ্ঠিত নহি। সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি এই আদর্শচরিত্রটীর এত নিকটবর্ত্তী যে ইহার সহিত উহাদের তুলনা করিতে গেলে, বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। এজন্য তাহাদিগকেও আমরা

আদর্শ নারীচরিত্র বলিতে পারি। কিন্তু তথাপি যাহারা ইহাদের ভিতরের সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকুও বুঝিতে চান, তাহা-দিগকে আমরা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিতে বলি।

এই বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "ভারত-মহিলা" নামক প্রবন্ধে যে কয়টী কথা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। সাধারণের গোচরার্থ সেই কয়টী কথা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,—

"দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীনকালের রমণী-চরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য * * বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন, তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোক-বৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিনী ছিলেন, বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য, রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন একজন অন্ধমুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণপোষণ করেন। * * *।

একবার সত্যবানকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন, শুনিলেন না। বলিলেন, এ সকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমন করিয়া † অন্ধ শ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একদিনের জন্যও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজ বর দিতে আসিলে, চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভবর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামীবিয়োগে

---

† এখানে শাস্ত্রী মহাশয় কাশীরাম দাসকে অনুসরণ করিতেছেন, বোধ হইতেছে। মূল গ্রন্থানুসারে সাবিত্রীর বিবাহ শ্বশুরালয়েই নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে * * রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন, সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয়া হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়া তাহাকে বিবাহ করেন? কোন্ রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাত সময়ে

হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ়নিশ্চয়া হইতে পারেন এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে, আপনার সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন ?

স্মৃতিসংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে, সাবিত্রীর তাহা সকলই ছিল। তাহার উপর উঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্যা হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী, সীতা প্রভৃতি রমণীগণ অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নত-চরিত্রা বলিয়া বোধ হয়।”

ইহার পরই শাস্ত্রী মহাশয় সীতা ও সাবিত্রী-চরিত্র দুইটী নিম্নলিখিতরূপ তুলনা করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম।

“সীতা ও সাবিত্রী দুই জনই অদ্বিতীয় রমণী।

পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন। তথাপি তিনি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোনস্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে শান্ত, সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে, তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না। এবং এমন কষ্ট নাই যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুই জনেরই মনের তেজস্বিতা আছে।

যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই।* সীতা ও সাবিত্রীকে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।"

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাবিত্রী-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, অধিকতর জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা বোধ হয় আর বাহির হয় নাই। সাবিত্রী-চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া তাহার দু'একটী কথাও এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই কয়টী কথা উপহার দিয়াই আমরা পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট এইবার বিদায় গ্রহণ করিব।

আর্য্যনারী-সমাজে সাবিত্রীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে

* এই স্থানে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ আছে। যিনি স্বামীর জন্য এত অলৌকিক সহিষ্ণুতা, এত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা আমরা কেমনে বিশ্বাস করিব?

যাইয়া বসু মহাশয় কহিতেছেন—"সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী—সকলেরই কথা সকলে সর্ব্বদাই কয়—সভায় কয়, সাহিত্যে কয়, সঙ্গীতে কয়। কিন্তু সভা, সাহিত্য, সঙ্গীত—কোথাও সাবিত্রীর কথা কেহ প্রায় কয় না। তাঁহারে স্পর্শ করিতে সকলেই যেন সঙ্কুচিত, কেহই যেন সাহস করে না। তিনি রমণী—কিন্তু তাঁহার মত রমণী বোধ হয় আর নাই।"

সাবিত্রীর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক বলের বর্ণনা করিতে যাইয়া বসু মহাশয় যে স্বর্ণাক্ষরগুলি সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

সাবিত্রীর শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি কহিতেছেন— "এমন যে দেহ, যৌবনের প্রারম্ভেই ইহাতে চিন্তা-রূপ কীট প্রবেশ করিল। সেই দুরন্ত কীট ক্ষুরধার দন্তে এক বৎসর কাল দিবানিশি সেই স্বর্ণকান্তি সুকোমল দেহের মর্ম্মস্থল কাটিল। তাহার পর সেই দেহে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস—সেই দেহে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গেল না। তখন সেই দেহ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইল। সে দেহ দেখিয়া সাবিত্রীর শ্বশুর শ্বশ্রূ ভীত ও ভাবিত হইলেন--কাতর বাক্যে তাঁহাকে ব্রত ভঙ্গ

করিতে বলিলেন। তিনি কিন্তু তখনও দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন—

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্‌।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্‌॥

অর্থাৎ, হে তাত, আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্ত করিতে পারিব। ব্রত সমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ, আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি।

বৎসরব্যাপী বিষম চিন্তায় জর্জ্জরিত দেহে উপর্য্যুপরি তিন দিন তিন রাত্রি বিন্দুমাত্র জল পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়াও সাবিত্রীর ব্রত পালনে এই 'অবিচলিত উৎসাহ'! এমনি উৎসাহ যে শ্বশুর শ্বশ্রূ অধিকতর কাতর হইয়া যখন তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন, তখনও তিনি তেমনি দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন :—

অস্তংগতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া॥

অর্থাৎ, এই কাম্য ' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সূর্য্য অস্তগত হইলে, আহার করিব।

কাঠের পুতুলটী হইয়াছেন, তথাপি সাবিত্রীর 'সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা' সমান রহিয়াছে। বনগমন কালে সত্যবান্ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি আর কখনও বনে যাও নাই, বনের পথ অতি ক্লেশকর, আবার উপবাস করিয়া তুমি কাহিল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। তিনি কিন্তু উত্তর করিলেন—উপবাস করিয়া আমি কাহিল হই নাই। শরীরে কিছুমাত্র অসুখ বোধ করি নাই, তোমার সহিত বনে যাইতে আমার অতিশয় ইচ্ছা ও আগ্রহ হইতেছে। * * এই সমস্ত দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। আরও অবাক্ হইতে হয়, মৃত পতিকে কোলে করিয়া সেই মহারণ্যে মহাকালের আগমনে কাঠের পুতুলটী যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া। কাঠের পুতুলটী মহাকালকে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হন নাই, মহাকালকে অবিচলিত ভাবে ধর্ম্ম কথা শুনাইয়াছিলেন, মহাকালের নিষেধসত্ত্বেও অদম্য উৎসাহ ও মহাতেজস্বিতা-সহকারে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রান্তির আশঙ্কা করিয়া মহাকাল যত বার তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন, ততবারই তিনি দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করিয়া-

ছিলেন। * * * তাহার পর কাঠের পুতুল কেমন করিয়া মহাকালের সহিত বহু দুর গিয়া, বহু কথা কহিয়া, বহু আয়াসে মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করাইয়া, সেই রাত্রেই পতির দেহভার আপন স্কন্ধ ও বাহুতে বহন করিয়া, সেই মহারণ্য ভেদ করিয়া, মৃতকল্প শ্বশুর শ্বশ্রূর কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা কথিত হইয়াছে।"

অতঃপর সাবিত্রীর মানসিক বলের কথা বলিতে যাইয়া বসু মহাশয় বলিতেছেনঃ—

"মনোময়ীর মনের কি শক্তি! চিন্ময়ীর চিত্তের কি গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা! বিবাহের পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন,—এক বৎসর পরে পতি কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মনোময়ী কেমন পতিব্রতা তাহা তো দেখা হইয়াছে। যে রমণীর সাবিত্রীর ন্যায় সতীত্ব, সাবিত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম এবং সাবিত্রীর ন্যায় পাতিব্রত্য, এক বৎসর পরে পতির মৃত্যু অনিবার্য্য জানিলে, তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়, সকলেই অনুমান করিতে পারেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন—নারদ যে সাংঘাতিক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, এক বৎসর কাল সাবিত্রীর মনে তাহা দিবানিশি জাগরূক ছিল—কি

শয়নে, কি উপবেশনে, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

সাবিত্র্যাস্তু শয়ানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বর্ত্ততে॥

দশ দিন এমন দুর্ভাবনায় থাকিলে, কত রমণী পাগল হইয়া যায়, কেহ হয়ত আপন প্রাণ আপনি নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু সাবিত্রীর মানসিক শক্তি অতি অসাধারণ। তাঁহার পতি এক বৎসর পরে মরিবেন, এ কথা তাঁহার শ্বশুর-গৃহে কেহই জানিতেন না, সত্যবান্ পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। সাবিত্রী যদি সামান্যা নারী হইতেন, তাহা হইলে, তিনি মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই এক প্রকার বুঝিয়া ফেলিত। তিনি বড় শক্ত হইলেও অন্ততঃ তাঁহার পতিকে বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সাবিত্রী সেই সাংঘাতিক কথা পতিকে পর্য্যন্ত বলেন নাই। তাঁহার মনে যে তেমন সাংঘাতিক কথা, সাংঘাতিক ব্যথা ছিল, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই; শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতিকে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে দেন নাই। সেই সাংঘাতিক কথা মনে লুকাইয়া রাখিয়া, ও সেই মর্ম্মান্তিক ব্যথায় কিছুমাত্র

বিচলিত প্রতীয়মানা না হইয়া, তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি এবং অপর সকলের এমনি সেবা শুশ্রূষা ও তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার মনে দুশ্চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না, অন্তরে কোন ব্যথাই স্থান পায় নাই।

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে ॥
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ ॥
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥

এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আজ সেই ভীষণ দিন। সন্ধ্যা আগত-প্রায়—সেই ভীষণ মুহূর্ত্ত আগত-প্রায়। পতির সহিত পতিব্রতা বনে প্রবেশ করিয়াছেন। সাবিত্রীর হৃদয় তখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, 'হৃদয়েন বিদূয়তা' বিদীর্ণ হইবারই কথা, তথাপি তিনি হাসিতে হাসিতে যাইতেছিলেন, 'হসন্তীব'! সত্যবান্ কিছুই জানিতেন না, সাবিত্রী তখনও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, তিনি বনের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া সাবিত্রীকে 'পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত দেখিতে বলিলেন। সাবিত্রীর তখন বনশোভা

দেখিবার সময় নয়, তাঁহার তখন মনে হইতেছে, যেন পতির মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—'মৃতমেব হি তং মেনে কালে'—তথাপি তিনি আপন হৃদয়কে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভাবনা লুকাইয়া, ভাবিতে লাগিলেন; অপরভাগে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া পতির সহিত অরণ্যের রমণীয়তার কথা কহিতে লাগিলেন।

অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী॥

এমন মনের শক্তি, সামর্থ্য ও পরিসর—এ চিত্তের বিশুদ্ধতা, বিকারবিহীনতা ও গভীরতা—সমস্তই কল্পনাতীত। ইহার কিছুরই আমাদের ধারণা হয় না।

কিন্তু এ মনের আরও শক্তি, আরও সামর্থ্য, আরও পরিসর মহাভারতের মহাকবি দেখাইয়াছেন। এতক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহা দিবালোকে বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সুস্থ, বলিষ্ঠ, আনন্দোৎফুল্ল সত্যবানের সঙ্গে থাকিয়া দেখা গেল। এইবার বড় ভিন্ন রূপ, বড় বিপরীত প্রকার দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—দিবালোক চলিয়া গিয়াছে, মহারণ্য

অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে, সত্যবান্ সহসা, মহা-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। নারদ-কথিত সেই ভীষণতম মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, সাবিত্রী দেখিলেন—যাঁহার নামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপে, সেই 'রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধ-মুকুট, দীর্ঘকায় লোহিতলোচন ভয়ঙ্কর পুরুষ' তাঁহারই পতিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়-মান। তথাপি তিনি যেমন তেমনি! সম্মুখে ভীষণতার ভীষণতম মূর্ত্তি, চারিপার্শ্বে ভীষণতার ভীষণতম সমাবেশ, তথাপি তিনি যেমন তেমনি! তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কাঁপিয়া উঠিবারই কথা, ভাঙ্গিয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্য, অন্য হৃদয় হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি কিন্তু আপনাতে আপনি এমনি সংযত যে, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হইবে, তথাপি ভয়ে পতির মস্তক ক্রোড় হইতে ফেলিয়া না দিয়া, পাছে তাহাতে এতটুকু আঘাত লাগে, এই জন্য ধীরে,—অতি ধীরে—তাহা নামাইয়া রাখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।

ধীরে, অতি ধীরে—তখনও ধীরে, অতি ধীরে—স্বামী সহসা কালনিদ্রাভিভূত, সহসা সম্মুখে মহাকাল—

তথাপি ধীরে, অতি ধীরে—এ কি ব্যাপার! এ কি কাণ্ড! মানুষের মনে ইহার ধ্যান ধারণা হয় না!"

নিশ্চয় হয় না! আমরাও এই চরিত্রের আর অধিক ধ্যান ধারণা করিতে না পারিয়া এইখানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।